হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

নলহাটী : বীরভূম

শিক্ষাবর্ষ - ২০২০-২০২২

হীরালাল ভকত কলেজ পরিবার।

কলেজ পরিচালন সমিতিঃ
স্বাগত ভাষণে ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী।

ীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

দিশারী

পত্রিকা উপসমিতি ঃঃ-

উপদেষ্টা
পক ড. নুরুল ইসলাম, অধ্যক্ষ
াল ভকত কলেজ

া সম্পাদক
পক অয়ন্তিকা সরকার
রী অধ্যাপক, সংস্কৃত বিভাগ

াগী সম্পাদক
সত্ত্ব ব্যানার্জী,
ী অধ্যাপক, ইংরাজী বিভাগ
নীল মন্ডল,
রী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

সদস্যবৃন্দ
ড. অমৃতা বিশ্বাস
অধ্যাপক পিঙ্কি দাস
ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী
অধ্যাপক সৈয়দ মানারুজ্জামান
ড. ইন্দ্রনীল মন্ডল
অধ্যাপক সুদীপ্তা সিংহ
ড. নীলাদ্রি দাস
ড. রেজাউল ইসলাম সানা
অধ্যাপক নন্দদুলাল মাহাতো
শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়
শ্রী ধনপতি মন্ডল

প্রচ্ছদ শিল্পী -
শ্রী অমিত মন্ডল

// বন্দেমাতরম্ // বন্দেমাতরম্ //

শিক্ষার প্রগতি ঃ সংঘবদ্ধ জীবন ঃ দেশপ্রেম

শিক্ষার সর্বস্তরে দুর্নীতি এবং শিক্ষা বিরোধী
পরিবেশ দূর করতে
ছাত্রছাত্রীগণ
সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ হন।

হীরালাল ভকত কলেজের বাৎসরিক পত্রিকা

'দিশারী'-র সাফল্য কামনায়

তৃণমূল ছাত্র পরিষদ, নলহাটী, বীরভূম

হীরালাল ভকত কলেজ পত্রিকা

পরিচালন সমিতি

শ্রী রাকেশ সিংহ	:	সভাপতি, পরিচালন সমিতি, সমাজ সেবক
ড. নুরুল ইসলাম	:	অধ্যক্ষ, হীরালাল ভকত কলেজ
ড. কোয়েল পাল	:	সরকারী প্রতিনিধি, বীরভূম মহাবিদ্যালয়
শ্রী ত্রিদিব ভট্টাচার্য্য	:	সরকারী প্রতিনিধি, সমাজসেবী
ড. হবিবুর চৌধুরী	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, কবি নজরুল কলেজ, মুরারই
ড. শিউলি চ্যাটার্জী	:	বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিনিধি, টুরকু হাঁসদা লপসা হেমব্রম মহাবিদ্যালয়
অধ্যাপক পিঙ্কি দাস	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
অধ্যাপক সৈয়দ এম. জামান	:	শিক্ষক প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ
শ্রী গৌতম পাঠক	:	শিক্ষাকর্মী প্রতিনিধি, হীরালাল ভকত কলেজ

পাঠদানে ব্রতী যাঁরা

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ : ড: গৌতম দে (সময়সীমা – ০৮.০৩.২০১৯ – ৩১.০৩.২০২১)

ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ : অধ্যাপক মুক্তিমান বিশ্বাস (সময়সীমা – ০১.০৪.২০২১ – ১৭.০৬.২০২১)

অধ্যক্ষ : ড: নুরুল ইসলাম (সময়সীমা – ১৮.০৬.২০২১ থেকে বর্তমান)

বাণিজ্য বিভাগ

অধ্যাপক শ্রীরূপা রায়, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অধ্যাপক শ্রী সলিল কুমার সেনগুপ্ত, সহযোগী অধ্যাপক।
শ্রী সুখেন কুমার মন্ডল, স্যাক্ট।
শ্রী গৌতম কুমার মন্ডল, স্যাক্ট।

বাংলা বিভাগ

অধ্যাপক বিশ্বনাথ পাহাড়ী, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অধ্যাপক পিঙ্কি দাস মুখোপাধ্যায়, সহকারী অধ্যাপক।
ড. অর্পিতা ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রীমতি গৌরী রানী হোড়, স্যাক্ট।
শ্রী দেবাশীষ ঘোষ, স্যাক্ট।
শ্রী দীপঙ্কর দে, স্যাক্ট।

ইংরেজী বিভাগ

ড. শুভব্রত ব্যানার্জী, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অধ্যাপক সুনীতা সিংহ, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রীমতি দেবারতি চ্যাটার্জী, স্যাক্ট।

সংস্কৃত বিভাগ

ড. রণবীর মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অরুন্তিকা সরকার, সহকারী অধ্যাপক।
ড. অভিজিৎ নন্দী, স্যাক্ট।
ড. শুভেন্দু মন্ডল, স্যাক্ট।
শ্রীমতি স্বর্ণালী চন্দ্র, স্যাক্ট।
শ্রীমতী সুনন্দা বিষ্ণু, স্যাক্ট।

আরবি বিভাগ

ড. মুখলেসুর রহমান, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
ড. বাকুল আলম, স্যাক্ট।

উর্দু বিভাগ

পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক অনুপস্থিত।

ইতিহাস বিভাগ

ড. অমৃতা বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অধ্যাপক সুকুমার মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক।
অধ্যাপক মনোজিৎ দাস, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রী. বাবর আলি, স্যাক্ট।
শ্রী কাজেম মন্ডল, স্যাক্ট।

ভূগোল বিভাগ

ড. নীলাদ্রি দাস, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
ড. ইন্দ্রনীল মন্ডল, সহকারী অধ্যাপক।
ড. রেজাউল সানা, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রী বিশ্বজিৎ মন্ডল, স্যাক্ট।
শ্রী চন্দন ঘোষ, স্যাক্ট।
শ্রী সজল ঘোষ, স্যাক্ট।
শ্রী বিপ্লব সেন, স্যাক্ট।

দর্শন বিভাগ

অধ্যাপক টোটন হাজরা, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
অধ্যাপক নন্দদুলাল মাহাতো, সহকারী অধ্যাপক।
শ্রী অরুনাভ দাস, স্যাক্ট।
শ্রী সুব্রত মন্ডল, স্যাক্ট।
শ্রী সফিকুল ইসলাম, স্যাক্ট।
শ্রীমতি সুচিত্রা দাস, স্যাক্ট।
শ্রীমতি মৌমিতা ব্যানার্জী, স্যাক্ট।

রাষ্ট্র বিজ্ঞান বিভাগ

অধ্যাপক সৈয়দ এম.জামান, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
শ্রী নীলমনি মুখার্জী, স্যাক্ট।
শ্রী ফায়াদুদ্দিন, স্যাক্ট।
শ্রীমতি তনুশ্রী সিনহা, স্যাক্ট।
শ্রীমতি রাইহানা নাসরিন, স্যাক্ট।

বিজ্ঞান বিভাগ

ড. বংশীধর সাহু, সহকারী অধ্যাপক (সায়েন্স কোর্ডিনেটর)।
শ্রী মহম্মদ আশিক মন্ডল, স্যাক্ট (পদার্থবিদ্যা)।
শ্রী সেখ আব্দুল হানিফ, স্যাক্ট (কম্পিউটার সায়েন্স)।

পরিবেশ বিভাগ

অধ্যাপক কৃতিমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক (বিভাগীয় প্রধান)।
শ্রীমতি তাপসী মুখোপাধ্যায়, স্যাক্ট।

শারীরশিক্ষা বিভাগ

শ্রী তপন মন্ডল, স্যাক্ট।

গ্রন্থাগারিক

শ্রী পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

শিক্ষাসহায়ক কর্মিবৃন্দ

শ্রী মলপতি মন্ডল, হেডক্লার্ক।
শ্রী সুভাষ ভৌমিক, অ্যাকাউন্ট্যান্ট (ক্যাসুয়াল)।
শ্রী শিশির কুমার দাস, ক্লার্ক।
শ্রী হুমায়ুন কবীর, ইলেকট্রিসিয়াল, ক্যাশিয়ার।
শ্রী পিন্টু কুমার মল্লিক, ক্লার্ক।
শ্রী বিপ্লব মারান্ডি, ক্লার্ক।
শ্রী গৌতম পাঠক, ক্লার্ক।
শ্রী পরেশ কুমার পাল, দারোয়াল।
শ্রী কৃষ্ণগোপাল নাথ, অফিস বেয়ারার।
শ্রীমতী কৃষ্ণা নাথ, লেডি অ্যাটেন্ডান্ট।
শ্রী গোবিন্দ ফুলমালী, ল্যাব অ্যাটেন্ডান্ট।
শ্রী জকিবুর রহমান, গার্ড।
শ্রী তাপস কুমার স্বর্ণকার, পিওন।
শ্রী জেহেদি হাসান, ল্যাব অ্যাটেন্ডান্ট।
শ্রী দিলিপ কুমার ফুলমালী, সুইপার (পার্টটাইম)।
শ্রী তকবির শেখ, সুইপার (পার্টটাইম)।
শ্রী রমেশ মাল, সুইপার (পার্টটাইম)।
শ্রী মফিজুল সেখ, ক্যাজুয়াল স্টাফ।
শ্রী সুমন জালা, ক্যাজুয়াল স্টাফ।
শ্রী সদাই কোলাই, ক্যাজুয়াল স্টাফ।
শ্রীমতী দীপিকা সাহানী, ক্যাজুয়াল স্টাফ।
শ্রীমতী চায়লা খাতুন, ক্যাজুয়াল স্টাফ।
শ্রী মহঃ মজিবুর রহমান, ক্যাজুয়াল স্টাফ।

লাইব্রেরী-স্টাফ

শ্রী মলয় মুখোপাধ্যায়, লাইব্রেরী ক্লার্ক।
শ্রী চন্দ্রশেখর লেট, লাইব্রেরী পিওন।

"বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায়...."

...পূর্ণ বিকশিত হওয়ার আগে ঝরে যাওয়া কুঁড়িগুলি...
... দেশের সীমানা রক্ষায় হাসিমুখে আত্মবিসর্জন দিয়েছেন যে সহীদেরা...
....স্বর্গলোকে ফিরে গেছেন যে স্বর্গসাধকেরা...
...জ্ঞানের প্রদীপশিখায় চারিপাশ আলোকিত করেছিলেন যে সরস্বতীর সেবকেরা...
...যাঁরা সমাজের অভিভাবক হে ছিলেন, সেইসব নমস্যব্যক্তিদের...
...অতিমারী ও সাময়িক দুর্বিপাকে অকালে নিভে গেছে যে সম্ভাবনাগুলি...

– নতুন প্রাণের আলোয় ভরে থাক
প্রকৃতিমায়ের কোল, এটুকুই প্রার্থনা।

সূচীপত্র

Message from Mr. Biplab Kumar Ojha, Former Prisedent, Governing Body		--	১০
Message from Mr. Rakesh Singh, Prisedent, Governing Body		--	১২
From the desk of Hon'ble Principal		--	১৩
Message from the desk of the Magazine Committee		--	১৫
পত্রিকা সম্পাদকের লেখায় -		--	১৭
- কবিতা -			
The Funeral of Time	*Late Abdul Rakib*	--	১৯
বীর জওয়ানদের শহিদ স্মরণে	*আয়াত আলাম*	--	২০
ভারতবর্ষ	*প্রদীপ কোনাই*	--	২০
শীতকাল	*সবনম খাতুন*	--	২০
প্রতিদান	*রেজিনা খাতুন*	--	২১
পাঠক	*সুস্মিতা দাস*	--	২১
মনের খেয়ালে	*ঝুমা মণ্ডল*	--	২২
মহাবিদ্যালয়	*এহেসান আলী*	--	২২
গাছ লাগাও প্রকৃতি বাঁচাও	*শর্মিষ্ঠা প্রামানিক*	--	২৩
পণের বাজার	*প্রভাতী মন্ডল*	--	২৩
বদলে যাওয়া 'চেঞ্জ'	--	--	২৩
সরস্বতী মা	*শুক্লা ভাস্কর*	--	২৪
হীরালাল ভকত কলেজ	*সায়ন ঘোষ*	--	২৪
ফুলের দল	*চুমকী দত্ত*	--	২৫
বসন্ত বাহার	*বুদ্ধদেব কোনাই*	--	২৫
চেতনার বাণী	*নূরে আলম*	--	২৬
ক্রিশমাস	*জেসমিন সুলতানা*	--	২৭
সেমিষ্টার	*রিংকী মন্ডল*	--	২৭
চাইনা মাগো ছুটি	*মলি রায়*	--	২৮
গ্রামটি আমার	*অনিন্দিতা মণ্ডল*	--	২৮
স্বপ্ন	*ডঃ শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী*	--	২৯
সন্তরণ	*দীপঙ্কর দে*	--	২৯
চেতনা বিষয়ক একটি সিরিজ কবিতা	*সৈয়দ এম. জামান*	--	৩০

- গল্প -			
একটি অতি অদ্ভুত মৌলিক পদার্থের পরিচয়	ড. রঞ্জিত কুমার সরকার	--	৩১
মিষ্টি বন্ধুর গল্প	তিথি ঘোষ	--	৩৩
সেই তাবিজটা	রৌমিক প্রামানিক	--	৩৪
সৌরভের স্বপ্ন	শ্যামাশ্রী মজুমদার	--	৩৬
"গানের তরী"	সাক্ষর ব্যানার্জী	--	৩৮
অপদেবতার গল্প	সোনা দাস	--	৪০
আমার ইংরাজী শিক্ষা কিংবা একটি বিড়ালের কাহিনী	ঋজু মন্ডল	--	৪১
- নাটক -			
মাষ্টারমশাই	অর্পন সেন	--	৪৩
- প্রবন্ধ -			
যুগপৎ	ইন্দ্রনীল মণ্ডল	--	৪৬
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাস : প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব ও সমাজ ভাবনা	কৃতিমান বিশ্বাস	--	৪৭
"বীরভূম জেলার আদিবাসী সমাজে বিশ্বায়নের প্রভাব"	ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী	--	৫৩
বাঙালির দর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ	স্বপন সাহা	--	৬২
আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি	ড. নুরুল ইসলাম	--	৬৫
ডুয়ার্সের চা সাম্রাজ্যের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সমস্যার সাতকাহন	মনোজিৎ দাস	--	৬৮
অনিবার্য	ড. চৈতন্য বিশ্বাস	--	৭৩
Proposed model of consortium in the field of higher education in West Bengal	Mr. Partha Chattopadhyay	--	৭৭
Lockdown in Memes : The Difference Between Humour and Satire	Priyanka Basu	--	৮৫
The Sound of Rain	Priyanka Basu	--	৯২
'শিক্ষা ও সমাজ'	জুঁই মুখার্জী	--	৯৫
'চাই বল,চাই স্বাস্থ্য,আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু...(প্রতিবেদন)	ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী	—	৯৬

Message from Mr. Biplab Kumar Ojha, President, Governing Body, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum (Session: 2019-20 & 2020-21)

I am really honoured and feel very privileged to function as the President of the Governing Body of Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum for the Academic Session: 2019-20 & 2020-21. These couple of academic sessions were the partingsessions of my prolonged association with this college as President, G.B. I started functioning in the said post in 2015 though as a well-wisher my attachments started since the very initiation of this magnanimous venture into the realm of Higher Education not only in Nalhati but also in the entire western part of Birbhum. Let me take this opportunity to thank the entire family of Hiralal Bhakat College for giving me the opportunity to serve the community up to my utmost capabilities.

We, at Hiralal Bhakat College, ensure high quality education which motivates and empowers our students to be lifelong learners and the productive members of the society. At this institution, education is not just the amount of information that is put into a student's brain. Our education system is the one that cater the individual needs of our students.

We want all our students to achieve their full potential. Our task is to make it possible and our mission is to provide a platform for the same.

Our primary focus has always remained on student welfare that focuses on the positive recognition of student achievements. Teachers at HBC are highly qualified and experienced educators who are committed to supporting each student's learning experience through quality instruction and guidance that addresses the needs of the individual child.

I, personally believe that an education system that develops the imagination of the student is richer than the one that does not. The imagination is where new ideas are created and progress becomes possible. Imagination, I feel is more important than knowledge because knowledge is about what we already know, whereas imagination is what moves individuals and cultures forward. Imagination leads to innovation.

HBC has a keen interest the activities that actively promote safe and healthy lifestyle and contribute effectively to sustainability and conservation of our environment. These activities are accomplished primarily through three NSS Unis and one NCC Unit of college.

RUSA Grant of Rs. 4,00,00,000/- has been received and a grand building of five stories has already been initiated. A land of 9.5 bigha has also been purchased and the 2nd campus of HBC is going to start functioning in that area.

I am sure that with the help of all the stakeholders and with their continuous support, we will be able to take our college to the next highest level of excellence. And college will always work for the best interests of our beloved students and our community at large. Let noble thoughts come to us from every side end enrich us for further advancements.

--

Message from Mr. Rakesh Singh, President, Governing Body, Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum (Session: 2021-22)

Education is about awakening - Awakening to the power and beauty tha lies within all of us.

To my mind education as an idea, is not just about bricks and concrete, but about building character, enriching minds and about varied experiences tha last a lifetime.

The vision of Hiralal Bhakat College is to give the students the all round capability including creativity, observation and knowledge empowermen leading to the generation of excellent, performing citizens with sterling char acter. I consider myself really grateful to have the opportunity to serve th family of Hiralal Bhakat College as the President of the Governing Body.

I would like HBC to practice RDCRAC behavior. The RDC RAC acronym is used to remind students "Responsibility, Integrity, Care Respect , Academic enterprise and Cooperation". These values, I believ will enable our students to take a leading role in learning and in life.

HBC will definitely provide a platform to its students to showca their inborn talents. We should take utmost care in moulding our students a responsible global citizens.

We have to be committed to the improvement and growth of the studen community. We would like to see them soar to new heights and taste success i all their endeavors. We are convinced that the purpose of education is to re place an empty mind with an open one.

I expect sincere cooperation from all the stakeholders of HBC fo attainment of these fundamental objectives.

--

From the desk of Hon'ble Principal

Educational Caravan

An institute is established to translate a vision of a great nation-builder into a reality. It is a brain child of a visionary social reformer. Hiralal Bhakat College is an outcome of such a vision. In a short span of time it has become a prestigious institution in northern region of Birbhum district. It was established on 20th October 1986. Since thousands of students have passed out from this institute. They have illuminated their respective domains of the greater society of this region. Nalhati and its surrounding areas are traditionally backward in every respect of human resources. But since the establishment of this College a lot of positive changes has been taken place. Many alumni of this great institute have been contributing a lot to uplift the backward society of this region.

Education is an effective instrument to revolutionize a society and a nation. Our great institute has a vision to play the same role. Hiralal Bhakat College has a pivotal role in rendering quality education in its catchment areas. "Recently we have started a campaign namely 'Educational Caravan' in its catchment areas to hold meetings with social activists, political leaders and guardians. Our expert team delivers lectures on higher education and competitive examinations and assures the local leaders and guardians an allout development of this region. We believe, our endeavour will surely bring success. We will bring the education to every door of this region. We want to make this area an educational hub. The people of this region will be leaders of social reformation and political leaders who will contribute a lot to our great nation. The people of this region will contribute enormously in the field of humanities, social sciences and advancement of technology. We have a lot of dedicated Professors and social activists who are constantly engaged in advancement of knowledge in dif-

ent fields.

Knowledge is power. In this age of information and technology without acquir
g knowledge and latest technology people can't be empowered. Empowerment and
nployment are possible through knowledge. We have initiated a long term campaign
motivate the people to concentrate on education. People must invest in the highe
ucation of their children. We are always there to provide all possible logistics fo
ality and higher education.

Students' magazine is a platform to ventilate ideas of students under the su
rvision of their teachers and preceptors. We publish it regularly. Due to pandemi
uation it was not possible to continue in the last two academic sessions. This year w
ve taken initiatives to mobilize all resources to publish it elegantly. Now the maga
ne is at your hands. We believe, all the articles, poems, rhymes etc. contained in thi
agazine are the manifestation of our blooming students' ideas.

We are thus ready with every possible aid essential for cherishing the talent
ing hidden in every youngster. "We have a well-equipped Geography Laboratory,
st library containing more than 26000 books and journals, a well-equipped gymna
um, strong NCC unit and three units of NSS. 52 dedicated Professors and 22 Non
aching staff members. A grand building is under construction to accommodate ou
er expanding academic activities. More than three acres of land have been pur
ased to expand our academic activities in the near future. In the current sessio
022-23) we are going to open the Study Centres of NSOU and Rabindra Bharati
cilitate the students who intend to pursue the Undergraduate and Postgraduat
urses in different streams in either Open Mode or Distance Mode.

Dr. Nurul Islam
Principal
Hiralal Bhakat College, Nalhati

Message from the desk of Magazine Committee

Hiralal Bhakat College is well known for its dedicated approach towards dissemination of knowledge in the academic world. The College appreciates the role of creativity in education and is committed to developing an inclination towards literary creativity in both faculty and students. In this pursuit, the College has taken the initiative to publish a magazine named Dishari since its very initiation to encourage students to pursue creative zeal under the guidance of the faculty of the College.

It is an annual publication launched exclusively to publish original and creative pieces of literature e.g. short stories, poems, plays and articles of different sort both by the students and the teachers on various topics and issues either in real life or in the imaginary domain of literary creativity.

In order to maintain high standards of publication, the Magazine Advisory Committee, Hiralal Bhakat College has been constituted. The said committee is the apex authority to take all decisions related to any kind of publication in Dishari. The decision of the committee is final and binding.

To maintain high standards, academic ethics and creative integrity, a rigorous process of review of the received works is followed along with screening of each manuscript received by the committee for publication. The works published in Dishari are original and not published or presented at any other public forum.

The last issue of Dishari was published in 2019 and Covid Pandemic then blocked the scope for its further publication. As the entire academic enterprise was only through online mode up to January 2022 the process of preparation for the publication of the next issue was resumed in February 2022 and original as well as creative works were received both from the students and teachers of the College till

May 2022. Then started the rigorous process of screening and editing them.

I congratulate all the students whose works are published in this Issue of Dishari and express my sincere thanks to their mentors. I would also like to thank all the teachers who contributed to the publication of the present issue of Dishari.

Dr. Suddhaswatta Banerjee
Member of Magazine Committee
Hiralal Bhakat College, Nalhati, Birbhum

হীরালাল ভকত কলেজ

ত্রিকা সম্পাদকের লেখনে ....

দীর্ঘ দুটি বছরের ব্যবধানে প্রকাশিত হতে চলেছে দিশারী'। যে দুটি বছর পৃথিবীর ইতিহাসে এক ভয়াবহ, দুঃসহ কাল হয়ে লেখা থাকবে। এক লহমায় সমস্ত মানবজাতির দুরন্ত গতিকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল ভয়াল অতিমারি 'করোনা'। আমরা, এই মানবজাতি, বিশ্বসংসারে নিজেদেরকে প্রায় সর্বশ্রেষ্ঠ মনে করা মানুষেরা কুল, বোধহয় কোনদিন কল্পনাতেও ভাবিনি যে, এইভাবে 'গৃহবন্দী' য়ে থাকতে হবে। শুধু নিজেদের বাড়িতে নয়, প্রয়োজনে একটি ঘরে 'নিভৃতবাস'-এর আশ্রয় নিতে হবে। কাছের মানুষদের সাথে যোগাযোগের মাধ্যম হবে মোবাইল। এরকম হবে কোনদিন ভেবেছিলাম কী স্বপ্নেও!

একের পর এক নতুন 'স্ট্রেন' এসেছে। বেঁচে থাকার লড়াই, সুস্থ থাকার লড়াই ক্রমশঃ কঠিন হয়েছে। শারীরিক অসুস্থতার পাশাপাশি মানসিক ভাবে দুর্বল হয়ে পড়েছে মানুষ। টি.ভি, খবরের কাগজ সবজায়গায় শুধুই মৃত্যুমিছিলের পরিসংখ্যান। বন্ধ হয়েছে স্কুল-কলেজ-অফিস, পার্ক-বেড়াতে যাওয়া সবকিছু। এ যেন খাঁচায় বন্দী পাখিটার মত অবস্থা- বাইরে থেকে যতক্ষন না কেউ দরজা খুলে দিচ্ছে, বন্দীজীবন।

এই 'ভালো না থাকার' সময়েও কিছু ভালোর স্পর্শ পেয়েছে মানুষ। পেয়েছে ডাক্তার স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরন্তর হার না মানা অদম্য প্রয়াস। বিজ্ঞানীদের নিরলস পরিশ্রম আবিষ্কার হয়েছে রোগ প্রতিরোধী টীকা, কিছুটা হলেও থামানো গেছে মৃত্যুস্রোত। ধীরলয়ে হলেও ছন্দে ফিরেছে জীবন। এই কঠিন সময়ে প্রকৃত সত্য অনুধাবন করেছি আমরা। শুধু মানুষ নয়, প্রকৃতির সব সন্তানদেরই সমানাধিকার রয়েছে এই পৃথিবীতে সুস্থভাবে বাস করার ক্ষেত্রে। মানুষ সেই অধিকার খর্ব করার চেষ্টা করলে প্রকৃতি প্রতিশোধ নেবেই। এই অতিমারি-কাল অনেক কিছু শিখিয়ে দিয়েছে আমাদের।

শিক্ষাঙ্গনেও বহু পরিবর্তন এসেছে, এসেছে 'অনলাইন ক্লাস', 'অনলাইন পরীক্ষা'। ছাত্র-শিক্ষকের চিরাচরিত সম্পর্কের সমীকরণে বদল ঘটেছে। ক্লাসরুম বদলে গেছে মোবাইলে ফোনে, আর বেঞ্চে বসে থাকা উৎসাহী কচি-কচি মুখগুলির পরিবর্তে রয়েছে কিছু স্থির ছবি। মেনে নিয়েছি, মানিয়ে নিয়েছি আমরা সবাই কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করিনি কেউই। আর তাই স্কুল-কলেজ খোলার সিদ্ধান্তে সবথেকে বেশি নিশ্চিন্ত হয়েছি কারণ ছাত্র-ছাত্রীরাই তো শিক্ষাঙ্গনের প্রাণ, ওদের প্রাণচঞ্চল উপস্থিতি ছাড়া এগুলি কেবলমাত্র ইঁট-কাঠ-সিমেন্টের বিল্ডিংমাত্র। ছাত্রছাত্রীরাই শিক্ষক-শিক্ষিকাদের পূর্ণতা দিতে পারে।

'দিশারী' সেই ছাত্র-শিক্ষক যুগলবন্দীর ক্ষুদ্র একটি প্রয়াস। ছেলেমেয়েদের কচি হাতের লেখা, তাদের

মনেরস্বপ্ন, বলতে চাওয়া কথা -এগুলিকে দুমলাটের মধ্যে রাখার চেষ্টাটুকু করেছিমাত্র। 'দিশারী' কে ভালোবে
গ্রহণ করবেন সকলে, আশা রাখি। অধ্যাপকবৃন্দ-শিক্ষার্থীরা-শিক্ষাকর্মী-পরিচালন সমিতি ও সর্বোপ
অধ্যক্ষমহোদয়ের সহযোগিতার কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ আমি।

'দিশারী' প্রকাশে মুদ্রণত্রুটি ইত্যাদি যা কিছু ভুল তার দায় একান্তই আমার। হীরালাল ভক
কলেজ ও 'দিশারী'-র চলার পথ সকলের আশীর্বাদে কুসুমোস্তীর্ণ হোক। আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই পরিব
পরিচালন সমিতিসহ হীরালাল ভকত কলেজের বৃহত্তর পরিবারের প্রত্যেক সদস্যকে, যাঁদের বিশ্বাস এবং সহযোগি
আমি এ কাজে ব্রতী হয়েছি। অলমিতি।

চিরন্তনের প্রাণসম্পদে ভরা থাক 'দিশারী'-র যাত্রাপথ।

—অয়ন্তিকা সরকার
'সম্পাদক'
'দিশারী'
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী

কোভিডবিধি মেনে ইতিহাস বিভাগে পঠন-পাঠন

হীরালাল ভকত কলেজ NCC UNIT : শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা এবং পরিশ্রমের অঙ্গীকার

প্রকৃতির কোলে ভূগোলের পাঠ : জয়ন্তী নদী।

ছাত্রছাত্রীদের বিনামূল্যে কোভিড ভ্যাকসিন প্রদান।

কোভিড বিধি পালনে দায়িত্বশীল কলেজ কর্তৃপক্ষ।

অতিমারিকালে ছাত্রছাত্রীদের বাড়িতে আর্থিক সহায়তা প্রদান করেন: অধ্যাপক শ্রী নীলমণি মুখোপাধ্যায় ও শিক্ষাকর্মী শ্রী পরেশ পাল মহাশয়।

কোভিডবিধিকে যথাযথ মান্যতা দিয়ে কলেজ প্রাঙ্গণ স্যানিটাইজ করা।

THE FUNERAL OF TIME

Late Abdul Rakib
Part Time Professor (Honorary)
Dept. of English

If Almighty God wills....
Time inscribes everything, Virtuous or Vicious
In the Large Net of the East and the West
It Passes through lost of Abortions
Of Faith and Mind....
The Pen is compelled to close the Mouth,
The Muscle accelerate the Mobs....
The Toilers still stick
To "the song to the Men of England."
The Earth of Impatient Times does cry
For the golden Past !!!
Toilsome Success also suffers from insecurities...
The Youth are insolent for the jobless Hands
Huge Tearful Times envelope them
In cancerous Despairs...
Adoration vanishes in the Air...
Arrogant Zeus sink into Incest...
The stream of Nepotism flows
From the pillar to post...
The splendid Mind can't harvest
The pleasures of hard-earned achievements
Alas! (The) Bahal Nagar (S) succumb to FATE!!!
Their tears can't die...
(The) Rich Tongues enjoy
The sweet Flavours of Politics,
Most (Mostest) youth are trapped in loveless holes!!!
Their Thirst for jobs is not quenched !!!
These are all Geneses of Time...?
They- The alive still stick to the Passage to Life
For Life...
Does it divorce the Evils
With the Dawn in the labour room
For good ?...?...?
Where's the Passage to Time ...?
Where's the golden Passage of Time?
Who are those fellows to rejoice
In the burial procession of Time ?..?..?
Who can lament for the Funeral to Time ?...?...?

বীর জওয়ানদের শহিদ স্মরণে

আহাত আলোম (বাংলা বিভাগ) প্রাক্তন ছাত্র

জঙ্গি হামলায় রক্তাক্ত পুলওয়ামা
লালে লাল হলো বীরেদের জামা।
ভালোবাসার দিনে পেলাম হিংস্রতার
পরিচয়,
গর্জে উঠল গোটা ভারতবাসী,
ঐ কাপুরুষ জঙ্গিদের চাই মোরা ফাঁসি।
এই ভাবে আর কতদিন চলবে ওগো
বিধাতা ?
আর কত অসহায় হবে বীরেদের পিতামাতা।
বিয়াল্লিশ জন শহীদ বীর পুরুষদের করি
আত্মার শান্তি কামনা,
ভালোবাসার ফুল দিয়ে ঢাকা হোক তাদের
রক্তের বিছানা।

ভারতবর্ষ

প্রদীপ কোনাই

ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ, ভারতবর্ষ
এই আমাদের দেশ ভারতবর্ষ।
আমাদের গর্ব, আমাদের প্রাণ
এই ভূমিতেই হয়েছিল শুরু প্রতিবাদী, বিপ্লবী গান।
আছেন রবীন্দ্রনাথ থেকে স্বামী বিবেকানন্দ আছে কত শত
আর আছেন বিদ্রোহী কবি নজরুল যিনি আমাদের গর্ব।
হয়তো আর পাবো না এমন, যা অমূল্য সম্পদ।
দেব না এদের হারাতে তাই আমাদের মন থেকে
রাখব মনে চিরদিন হৃদয়ে ছবি এঁকে।
তাইতো বলি আমাদের দেশ ভারতবর্ষ
মোদের প্রাণ, মোদের গর্ব ভারতবর্ষ।

শীতকাল

সবনম খাতুন

কুয়াশা মাখা মেঘলা আকাশ
উত্তুরে বায় দেয় শীতের আভাস।
মিষ্টি রোদে উঁকি মারে কুয়াশার চাদর বেয়ে
ঝলমল করে শিশির ভেজা ঘাসের উপর দিয়ে।
সোনার ধান ধরে আনে চাষিদের মুখ
বাগানে কত রকমের রসে ভরা ফল।
খেজুর গুড় দিয়ে পিঠে পুলি ধরে ধরে
পাখিরা ঝাঁকে ঝাঁকে পাড়িদেয় চত্বরে।
মায়ের হাতের নতুন নতুন সবজি রান্না
খাবার জন্য আমরা করি শুধু বাইনা।
চায়ের বোঁয়ায় জলকনা লাগে চশমার ফ্রেমে
বিকেল বেলায় সবাই আসে খুচকার প্রেমে।
ঠোঁটে লাগায় ভেসলিন আর ফাটলে বোরোলিন
এতেই শীতে রূপচর্চা. থাকতে হবে না মলিন।
এই ভাবে কাটে অনেকটা সময়
শীতকাল যে বড় বৈচিত্রময়।

প্রতিদান

রেজিনা খাতুন [চতুর্থ সেমিস্টার]

আমার এঘর ভাঙিয়াছে যেবা
আমি বাঁধি তার ঘর,
আপনা করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী,
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি।
দিবস রজনি তার তরে জাগি
ঘুম যে হয়েছে মোর,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া
তার লাগি আমি কাঁদি।
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরাবানা
আমি দেই তারে বুক ভরা গান,
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান
সারাটি জনমভর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।
মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে
আমি তার বুক ভরি।
রঙিন ফুলের সোহাগ জড়ানো ফুলের ডালি।
যে মুখে সে কহে নিধুরিয়া বানি,
আমি লয়ে সখী, তার মুখখানি
কত চাই হতে কত কী যে আনি
সাজাই নিরন্তর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই
যে মোরে করেছে পর।

পাঠক

সুস্মিতা দাস [দ্বিতীয় সেমেস্টার
বাংলা বিভাগ]

জীবনটাকে বই মনে করে,
পাতা খুলি আর পড়ি
কত কাহিনী তাতে লেখা আছে
হিসাব মেলে না তারই।
হাসি কান্নার কত কোলাহল
কান পেতে আমি শুনি
ভোরের আলোয় ঘুমভাঙা গান,
সাঁঝের বেলার উদাসিনী প্রাণ,
প্রেম বিরহ হাসি কান্নার
ছোটো ছোটো কথাগুলি
বাতায়ণ থেকে প্রেমের আকাশে
দেখি যেন কারা অশ্রুজলে ভাসে।
ফিরে ফিরে আসে
ফিরে ফিরে চায়।
তবুও জীবনের পাতা; হয়ে থাকে সাদা
নতুন প্রাণের সুরের আলাপে রঙিন ছবির খোঁজে।

মনের খেয়ালে

ঝুমা মন্ডল (বাংলা বিভাগ)
চতুর্থ সেমিস্টার

ওই যে দূরে নীল আকাশে মেঘের কত রং,
তারই মাঝে ওই সূর্যের রামধনুরই রং।
ওইখানেতে আছে নাকি এক নীল পরীদের দেশ,
যেখানে স্রোতে উড়ছে তাদের মাথার এলোকেশ।
সোনার কাঠি রূপার কাঠি আছে তাদের হাতে,
গলায় তাদের মুক্তোমালা হাল্কা হাসি ঠোঁটে।
রঙের বাহার প্রজাপতি করে ফুলে মাতামাতি,
গাছের ডালে মিষ্টি সুরে পাখিরা দেয় ডাক।
সে যেন স্বপ্নময়, আজব নতুন দেশ–
সবাই থাকে আনন্দেতে, না পায় দুঃখের রেশ।
চলছি সেই অজানা দেশে না আছে কেউ আমার সাথে
নীলপরীরা যেন আমায় ডাকছে সেথায় হাতছানিতে
এসব কথা ভাবছি যখন আকাশ পানে চেয়ে
হঠাৎ দেখি বৃষ্টি ফোঁটা পড়ল এসে গায়ে
ভাবি আমার মনেরই ভুল এসব মনের কল্পনা
যা এলো সব ক্ষণস্থায়ী, যেন জলেরই আল্পনা।

মহাবিদ্যালয়

মহেসান আলী (বাংলা বিভাগ)
চতুর্থ সেমেস্টার

দেখলাম, অনেক দিনের পর
ঐ স্নেহশীলা বাড়িটার ভাঙা দরজাটা
দেখলাম।
আলোড়িত চঞ্চল মন
বিচলিত থাকতো সারাক্ষন
সেই সব দিনে জুড়াদ্রি প্রাণে।
আজ সে সর্বস্বান্ত,
আজ তাকে চিরবিদ্রিত
দেখলাম।
পথ দিয়ে যেতে যেতে
শঙ্কিত প্রাণটা নিয়ে হাতে
সবুজ দেহ তার ধূসর হয়েছে
দেখলাম।
খুঁজেছিল পথ সে আমার দিকে চেয়ে
আমি টালবাহানায় রাস্তা তার বেয়ে
চললাম গন্তব্যে লক্ষ্য রেখে,
খুঁজে খুঁজে ব্যর্থ হল সে
কেবল আমি চুপি চুপি দেখলাম।
আমি ভ্রমর হয়ে বসলাম তার মূলে
মধুহীন দেহখানি কেবল বাতাসে দুলে
প্রীতিপূর্ণ স্নেহাস্পদ গেছে তার চলে
কেবল পড়ে আছে শ্রান্ত বাহখানি
তা-ই দেখলাম দুচোখ মিলে –
তবু দেখলাম।

গাছ লাগাও প্রকৃতি বাঁচাও

শর্মিষ্ঠা প্রামানিক
ইংরেজী বিভাগ (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

অনবরত হারাচ্ছে আজ প্রাকৃতিক সৌন্দর্য,
গাছ লাগানো তাই গুরুত্বপূর্ণ একটি কার্য।
দূষণযুক্ত পৃথিবীতে সবুজ আজ হচ্ছে ধূসর।
গাছ লাগানোর জন্য তবে মানুষের সেই অবসর ?
সবুজ হয়েছে বিবর্ণ এখন ক্রমাগত দূষণে
আঘাত পাচ্ছে প্রকৃতি তাই বারবার অকারণে।
প্রচুর পরিমানে গাছ লাগানো হবে যেদিন
হয়ে উঠবে পৃথিবী আবার সবুজে রঙিন।
গাছ লাগানো খুব বেশি প্রয়োজন
তবেই রক্ষা পাবে প্রকৃতি তখন।
তাই বলি, গাছ লাগাও প্রকৃতি বাঁচাও
আর প্রকৃতিকে ভালোবেসে যাও।

পণের বাজার

প্রভাতী মন্ডল
দ্বিতীয় সেমেষ্টার

পণের বাজার গরম কত,
বলব কি আর ভাই।
ছোটো বড়ো সবাই জানে,
পণের কদরটাই।
ছেলের বাবা বলেন, বেয়াই
আপনি বড়ো মানি।
আমার ঘরে মেয়ে দিলে,
কাজ হবে একখানি।
হাজার পঞ্চাশ সঙ্গে দেবেন,

বদলে যাওয়া 'চেঞ্জ'

নিরিবিলি ঘন সবুজ ঘেরা পথের পাশ,
কোলাহলে, লাল, হলুদ, ছুঁতে চায় আকাশ।
চাইনিজ আগ্রাসন গুড়, চিড়ে, মুড়ির বাটিতে
চাঁদমামা, শুকতারা মগ্ন টম ও জেরীর খুনসুটিতে।
বাউলের উদাস সুর, মন ভোলানো না একতারা,
ডিজে ডিস্ক, পপ-রকে বাঁধন ছাড়া প্রাণ পাগল পারা।
বিকেলে পাড়ার মাঠের দুরন্ত ফুটবল।
ক্যাফের ঠান্ডা ঘরে, লেটেস্ট গেমে 'এভেলেবল্'
গ্রামে গ্রামে যাত্রা, নাটক, বাতাসে গানের জলসা,
জলসা এখন স্টার, বোকাবাক্সে নতুন ভাষা।
'স্মরণিকার' স্মরনে অতীত আজ অতি আধুনিক,
'ব্যাকডেটেড' যা কিছু বদলানো কী খুব আবশ্যিক ?

তেমন বেশি নয়
নিউ মডেলের গাড়ি একটা,
ছেলেও সেটাই চায়।
খাট, পালঙ্ক, কালার টিভি
ফ্রিজ কুলার যত...
এসব দেবেন জানিই আমি,
খরচটাই বা কত ?
মেয়ে আপনার খাসা মেয়ে,
যেন সোনার শশী
সাজাতে তাকে ভরি দশেক,
সোনা কি খুব বেশি ?
সব কিছুই তো থাকবে মেয়ের,
আমরা কি আর নেব ?
ভেবে দেখুন, রাজী হলেই
ছেলের বিয়ে দেব।

সরস্বতী মা

শুক্লা ভাস্কর (বাংলা অনার্স) প্রাক্তন ছাত্রী

সরস্বতী নামে ওগো বিদ্যাপ্রদায়িনী
চন্দনে চর্চিত দেহ, শ্বেত বসনধারী।
কণ্ঠভরা মিষ্টি সুর ওগো বীনাপানি
সঙ্গীত সাধনায় তুমিই সঙ্গীত ঈশ্বরী।
তুমি তো মা বাগেশ্বরী লেখনি ধারিনী
তোমায় কৃপায় ধন্য মাগো যত জ্ঞানীগুনী।
নানান গুনে পূর্ণ তুমি শারদা নন্দিনী
কমললোচনা আবার অরূপরতনী।
বছর ঘুরে মর্ত্যলোকে তোমার আগমন
পিঠে তোমায় নিয়ে এলো রাজহংস বাহন।
খুশির প্লাবন বাঁধ ভেঙেছে তোমায় কাছে পেয়ে
পুলকিত আকাশ বাতাস শীতের সকাল জুড়ে।
স্নান সেরে সবাই মিলে পুজোর আয়োজন
ফল ফুল অঞ্জলিতে করি তোমার পূজন।
ছোটদের হাতে খড়ির এই শুভদিন
দাও মাগো বিদ্যাবুদ্ধি ওদের চিরদিন।
তোমার আশীষ দিও মাগো এই প্রার্থনা করি
মানুষের মতো মানুষ যেন আমরা হতে পারি।

হীরালাল ভকত কলেজ

সায়ন ঘোষ

ইংরেজী বিভাগ (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

হীরালাল ভকত কলেজের ছাত্র আমি
গর্ব করে বলি,
তাইতো আমি কলেজের সব
নিয়ম মেনে চলি।
অধ্যাপক এবং অধ্যাপিকা সবাই
কতই ভালোবাসেন,
এই আশাতেই পড়ুয়ারা সব
দলে দলে আসে,
পড়াশোনা ছাড়াও এখানে
NCC শেখানো হয়,
নিয়ম মতো উৎসব অনুষ্ঠান
ক্রীড়া প্রতিযোগিতাও হয়।
এত শিক্ষা পেয়ে আমার
বড্ড লাগে ভালো,
মানুষের মতো মানুষ হতে
হীরালাল ভকত কলেজ চলে

ফুলের দল

চুমকী দত্ত (বাংলা অর্নাস)

দ্বিতীয় সেমেস্টার

গাছের সেরা ধনটি তোরা
ওরে ফুলে দল।
রঙিন হ'য়ে থাকিস ফুটে
করিস যে জ্বলজ্বল,
তোদের ভাষা কেউ বোঝেনা
কিন্তু জানি আমি
সবার স্নেহের পাত্র তোরা
সবার কাছেই দামী
ভ্রমর অলি ছুটে আসে
তোর পরাগের লোভে
তাদের প্রাণের শ্রেষ্ঠ আসা
কখন তোকে ছোঁবে।
তোদের ছাড়া বাগ-বাগিচার
জনম যে দুর্লভ
তোরাই ওদের চোখের মনি
তোদের নিয়েই সব
এক নজরে মানবজাতির
হৃদয়ে স্থান পাস
ভালবাসার গন্ধে যে তাই
আকুল ক'রে যাস।
তোদের নিয়ে তাইতো ওদের
যতই চঞ্চলতা
তোদের নিয়েই জানায় ওরা
মনের গভীর কথা।
দেব-দেবীরাও তোদের সবে
বড়ই ভালোবাসে
তোদের মালা কণ্ঠে প'রে
আনন্দেতে হাসে
রূপে গুণে করলি সবার
মনের আসন জয়।
তোদের জন্য ভালোবাসা
সবার প্রাণেই রয়।
বসলে এত সবাই ভালো
কেমন মজা লাগে,
একটু খুলে বলনা আমায়
মনে যে সাধ জাগে।

বসন্ত বাহার

বুদ্ধদেব কোনাই

তোমারি সুন্দর লাজে ফুলে ফুলে অলি
ঋতুরাজে নব সাজে রাঙা ফুল ফোটে,
ধরাতলে বাত শত রাঙা ফুল ফোটে,
কলি হতে করে পান, উড়ে যায় চলি।
বিশ্বমাঝে শ্রেষ্ঠ তুমি স্নিগ্ধ তব প্রভা,
কূজনে মাতিল আজি দুটি মনোহর।
দেখিয়া জুড়ায় আঁখি ওই প্রভাকর,
রঙে রঙে সেজে ওঠে অপরূপ শোভা
কাননেতে দোঁহে মিলে বিধুমুখী লাজে,
নিকটে আসিলে ওগো, জাগে শিহরণ।
কৃষ্ণচূড়া শোভে আজি ধরাতল মাঝে,
দিকে দিকে পুষ্পবৃষ্টি শোভিত কানন।
দিগন্তে তপন ওগো তব চির সাঁঝে
ওগো ঋতুরাজ তুমি, ভরাইলে মন।।

চেতনার বাণী

নূরে আলম (ইংরাজী অনার্স)

হে ভবিষ্যত মোর ইতিহাস, বাংলা তুমিতো শোনো।
হতভাগ্যের বাঁধন ঘেরায়, হে বাংলা তুমি কেন।।
গৌরব মাঝে সৌরভ তুমি, শান্তির তোমার প্রতীক।
শৃংখলাহীন মার আঁচলের, সমাজ চতুর্দিক।।
শংখলাহীন দেশ আমাদের, বিশৃংখলায় ভরা।
ভুবন মাঝে ছিল এই দেশ, স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা।।
বিদ্রোহীর অমর ভাষা গেলো গো সমাজ ভুলে
দুই সহোদর ভাইগো আমরা, বাংলা মায়ের ছেলে।।
নিষ্ঠুর এই ধর্ম ফাঁদে, অসহায় মোর দেশ..
বাঁচাও আমার ধরিত্রীকে, যাচ্ছে হয়ে শেষ।।
লিখিলেন রবি দেশের মাটিতে, ঠেকিয়ে তাঁর মাথা..
শিকল পরালেও থামলনা, নজরুলের কবিতা।।
পরালেন রবি মসজিদে-দ্বারে, সকল হাতেই রাখি..
নজরুল কন দুইটি কুসুম, একই বৃন্তেই থাকি।।
কোথা গেল সব নজরুল বানী, রবিরচিন্তা ধারা..
দ্বিজেন্দ্রলাল কেও অসত্য কয়, দেশের খলনায়কেরা।।
ধন ধান্যে পুষ্পে ভরা, দেশটা ছিল মোদের..
বৃথা গেল সব স্বাধীনতায়, প্রাণ গিয়েছে যাদের।।
নিশিদিন যারা দেখলো স্বপ্ন, গড়বে সোনার বাংলা..
স্বাধীন সমাজ করলো গো আজ, শহীদ প্রাণে হামলা।।
রক্তদানের সময় তোমরা কখনও কী বলেছো।
কোন ধর্মের রক্ত এটা, বোতলে রেখেছো।।
সমাজ গড়ার নতুন কাজে দেখাও না গো জেদ।
তাহলে এসব ধর্ম নিয়ে কেন এত ভেদা ভেদ।।
স্বাধীনতার বলিদান যত, মেটাও তো দেখি দাম..
কর্মের আগে ধর্ম তো নয়, ধর্মের আগে কাম।।
ফাঁসির মঞ্চ গুলি বর্ষণ, সাতচল্লিশের আগে..
সহস্র প্রান হয়েছে শহীদ, দেখনা তোমরার জেগে।।
লজ্জিত সেই শহীদের সব, মায়ের অপমানে
সাজিয়ে ছিলো এ বাংলা যারা, রক্ত-অলঙ্কারে।।
বাংলা মায়ের সেরা সন্তান, তোমরাতো খুব দড়া..
দাও নাগো কেউ ইতিহাস কেও, অসত্য বলে সাড়া।।
অনাথ দুখির যাচ্ছেতো কেটে, নিশিদিন অনাহারে..
ধার দিতে আজ ব্যস্ত সমাজ, যুদ্ধের হাতিয়ারে।।
হাতিয়ারে কেউ দিয়ে নাগো ধার, হৃদয়েতে দাও ধার..
ছড়িয়ে যাবেই ভালোবাসা এই, সমাজেতে সবাকার।।
মার আঁচলের সন্তানেরা দাঁড়াও গো এসে ফিরে..
চায় গো শান্তি বাংলার আমি, সভ্যতারই সুরে।।
নতুন সুখের আপন হয়, সমাজকে করো আপন..
এলো মেলো এই বাংলার বুকে, শান্তি করোগো বরন।।
সোনালি ফসলে ভরা মোর দেশ, সবুজে ভরা শস্য..
বিশ্বসেরা, সর্বসেরা ওগো, আমারই ভারতবর্ষ।।
স্বাধীন হয়েও অড়াম মোরা, গোলাম হয়ে চলি..
বোবা অন্তর চুপ করে রয়, বেবাক তাহাই বলি।।
ভালোবাসার ছাউনি দিয়ে, দেশটি আমার ঢাকা..
মানচিত্রের ভারতবর্ষ মোর রামধনুতে আঁকা।

ক্রিশমাস

জেসমিন সুলতানা

ইতিহাস অনার্স ষষ্ঠ সেমেস্টার

ক্রিশমাসে যিশু হাসে মেরি মায়ের কোলে।
পেয়ে শিশু গোয়ালঘরে মন উঠে দোলে।।
বেথলেহেমে তাঁহি নিবাস থাকেন জগৎময়।
শান্তিবাণীর আধার রূপে করেন হৃদয়জয়।।
সত্য রসে শান্তি আসে মানবজাতির মনে।
শিষ্য হল অনেকজনে এসে ক্ষণে ক্ষণে।।
বুঝল যারা মানল তারা যিশুর অভয় বাণী।
গড়ল তারাই শৃঙ্খলাময় জীবন অনেকখানি।।
মৃত্যুবিধান পাদরি দিল সত্য সেবার দায়ে।
অনুঝরা সব মারল পেরেক যিশুর হাতে পায়ে।।
জীবন দিয়েও তাদের হাতে ক্ষমা করেন যিশু।
তিনি হলেন বিশ্ব মাতা মহান পিতার শিশু।।
সবার মনে আলো জ্বলুক ক্রিশমাসের রাতে।
আলোর সোহাগ মেখে সবাই মিলব সবার সাথে।।

সেমিস্টার

রিংকী মন্ডল (চতুর্থ সেমেস্টার)

শুনছি নাকি স্নাতক স্তরে,
এসেছে নতুন পাঠ্য রীতি।
সেই রীতিতে বদল হল,
বর্ষভিত্তিক পাঠের সূচী।
পরীক্ষা হবে ছয়মাস পরে
তিন বছরে ছয়টি,
এছাড়াও আবার আভ্যন্তরীণ
তাও আবার বারোটি।
পরীক্ষার পর পরীক্ষা আসে
কলেজ নিয়েই সময় কাটে,
পড়তে বসেই পড়ার মাঝে
অ্যাসাইনমেন্ট এর কথা মনে ভাসে।
পরীক্ষা শেষে মার্কশীট আসে
কিন্তু, কিছুই লেখা থাকে না তাতে,
কোন বিষয়ে কত পেলাম আর কত পেলাম না
মার্কশীট দেখে আমরা সে সব কিছুই বুঝতে পারিনা।
সেমিস্টার ভাই মজা ভারি
ফল প্রকাশ হয় তাড়াতাড়ি,
কিন্তু গ্রেড, ক্রেডিটস্যুনু কী ?
আজও যেন বুঝতে নারি।
সেমিস্টারে তাই সবাই খুশি
নম্বর পাচ্ছে বেশি বেশি,
কিন্তু তাতে হবেটা কী ?
জ্ঞানের বেলায় তো সবই ফাঁকি।

চাইনা মাগো ছুটি

মনি রায় (চতুর্থ সেমেস্টার)

বইয়ের উপর জমেছে মা দেখো কত ধুলো
আটসাঁট হয়ে গেছে স্কুলের পোশাক গুলো।
আর কতদিন থাকবে ছুটি, কবে যাব স্কুলে?
যা কিছু মা শিখেছিলাম যাচ্ছি সবই ভুলে।
পড়ার খেলা, খেলার পড়া মিথ্যে এখন সবই
সারাটা দিন ভাবনাগে না আঁকতে বসে ছবি।
হাসি ছিল, গান ছিল, ছিল নানান মজা --
কার দোষে মা পাচ্ছি বল এখন এমন সাজা ?
এখন শুধু চুপটি করে থাকি মা গো ঘরে
জানালা দিয়ে সূর্য এসে ডাক দিয়ে যায় ভোরে
নীল আকাশে পাখিরা সব ওড়ে আপন মনে
আমরা তবে আছি কেন বদ্ধ ঘরের কোনে।
কত রঙের মেয়েরা সব করে লুটোপুটি
দিনের পরে দিন কেটে যায় শেষ হয়না ছুটি
এমনি করে আর কতদিন থাকব ঘরের কোনে
শেষ করে মা স্কুলে গেছি পড়ে না আর মনে।

গ্রামটি আমার

অনিন্দিতা মণ্ডল (বাংলা বিভাগ)

আমার বাড়ি পুকুর ধারে
বড় একটি গ্রাম,
আম,জাম,কাঁঠালের গাছে ঘেরা
তৈলপাড়া নাম।
আমার গ্রামের প্রান ঘেঁষে ব্রাহ্মনী নদী
যায় সে এঁকে বেঁকে চলেছে নিরবধি।
গাঁয়ের বুকে আর আজ সবুজ গাছের সারি
আছে পুকুর, তাল, খেজুর রসের হাঁড়ি।
রাস্তা মোদের পাকা এখন
নেই কোনো কাদা।
গ্রামের মানুষ কৃষক মজুর
মনটা তাদের সাদা।
আসে হাওয়া পুকুড় পাড়ে বাঁশের বনে বনে
এসব ছেড়ে কোথায় যাব
কোথায় বা কোনখানে।
আমার গ্রামের নামটি থাকুক সবার কাছে জানা,
শহরে গেলেও আমার গ্রামের সুখ যাবে না কেনা,

স্বপ্ন

ডঃ শুভ্রসত্ত্ব ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক
ইংরাজি বিভাগ

স্বপ্নরা যখন উড়তে শেখায়,
মেলতে শেখায় ডানা,
বাস্তব তখন চোখ রাঙিয়ে
শুধুই করে মানা।
লোহার খাঁচায় বদ্ধ জীবন
বাস্তব কারাগারে,
স্বপ্ন এদিকে আলোর ঝলক
ফেরি করে ঘরে ঘরে।
যাপিত সুখের হিসেবে ব্যস্ত
বাস্তব অনুভবী,
স্বপ্নের ভাগে থেকে যায় তাই
আনন্দ ভৈরবী।
চেনা জীবনের ছকে পাঠ
গ্রাস করে শৈশব,
স্বপ্ন আনে অচিনপুরের
বিচিত্র বৈভব।

সন্তরণ

দীপঙ্কর দে
স্যাক্ট, বাংলা বিভাগ

সময়কে কখনো আমি স্রোতের অভিমুখে ভাবতে পারিনি। ছেড়ে দিতে পারিনি নিজের দেহভার স্থির দুই করতলের ওপর। গোঁয়ারের মতো জল কাটতে চেয়েছি। উজানের ঘাটে ভিজে থান পরে এলাচুলে দাঁড়িয়ে থেকেছে যে নারী, তার পদতলে ফিরতে চেয়েছি আজীবনকাল। যখন ভেবেছি এইবার কিছুটা এগোলুম বুঝি! সে নারীর মুখ ততোটাই আরো দূরে সরে গেছে। পাশ দিয়ে বয়ে গেছে দাহকার্যে অবশিষ্ট পোড়া কাঠ। হাত বাড়াতে গিয়ে থমকে থেকেছি। মনে পড়েছে মৃত্যু তো আমার নয়, আমার এখনো ভালোবাসা অবশিষ্ট রয়েছে। স্রোতের বিপরীতে সাঁতার কাটলে কিছু চারা মাছ এখনো সঙ্গ দেয় বুঝি।

চেতনা বিষয়ক একটি সিরিজ কবিতা

সৈয়দ এম. জামান
অধ্যাপক, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ

১) হাস ফ্যাশনের যুগে
একটি জীবন যন্ত্রনার পাঠ
বড্ড ম্যাড়মেড়ে,
ব্যাকডেটেড সিলেবাস।
জাবর কাটা জীবন
আধুনিক সাঁতারের অনুপযোগী
যৌবনের প্রাপ্তি বলতে
যৌন উত্তেজনা ছাড়া কিছু নেই
ডুবে গেছে নৌকা এখন ডুবছে ডুবুরি।
এখন ডুবছে, ডুবুরি

২) ক্রমাগত হাওয়া ভাসিয়ে দিচ্ছ দর্শন
একবার মাটির কাছে যাও এবং
মানুষের খুব কাছাকাছি
এবং সয়ে যাচ্ছে মানুষ ক্রমাগত

৩) অবাঞ্ছিত স্বাধীনতার
সিগারেট ধরে টানছি
নেশাখোর, নেশায় বুঁদ
আগুনে হাত পুড়ছে না হৃদপিন্ডও না
চারিদিকে স্পষ্ট ধোঁয়া
চোখে ঝাপসা
কিন্তু টানতে টানতে ক্রমশ
ঠোঁটে এসে যাবে আগুন
নেশাখোর, নেশায় বুঁদ।

৪) উদভ্রান্ত পৃথিবী, বিভ্রান্ত বাতাস
করোনার গ্রাস
করোনা-যুদ্ধ, যুদ্ধ কর না---
চোরাগোপ্তা শিকার নয়তোবা
আনবিক আত্মীয়তা
চরম অসহিষ্ণুতা
দেশে দেশে বিদ্বেষে
মানবিকতার ব্যর্থ পরিহাস
জলে স্থলে মিশে আছে
পরিযায়ী শ্রমিকের লাশ
যুদ্ধ না ওরা শান্তি চায়
নাকি শান্তির জন্য যুদ্ধ চায়
বিশ্ব গাঁয়ের পাড়ায় পাড়ায়
এখন চলছে বিতর্ক
তোমার সতর্ক হও
অমর চেতনা

৫) আমরা হৃদপিন্ড নিয়ে
গবেষণা করি
কিছু হৃদপিন্ড সোনার গিলটি করা চকচকে
কিছু হৃদপিন্ড মাটির
মাটির গুলো ক্রমশ মাটি হয়ে যাচ্ছে

এসো আমরা বৃক্ষ রোপণ করি।।

বর্ষীয়ান অধ্যাপক ড. চৈতন্য বিশ্বাস মহাশয়ের বিদায় সম্বর্ধনা অনুষ্ঠান।

মাননীয় অধ্যাপক শ্রী চৈতন্য বিশ্বাসকে স্মারকপত্র প্রদান করছেন অধ্যক্ষ শ্রী নুরুল ইসলাম মহাশয়।

সুরের আলাপ : অধ্যাপিকা শ্রীরূপা রায়

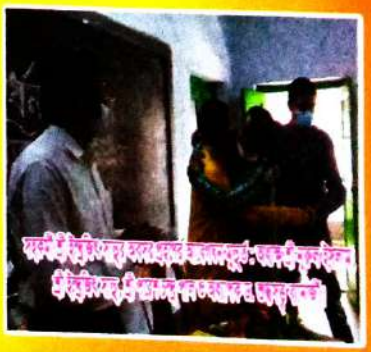

সূত্রের আলাপ: অধ্যাপক শ্রী অরুণাভ দাস।

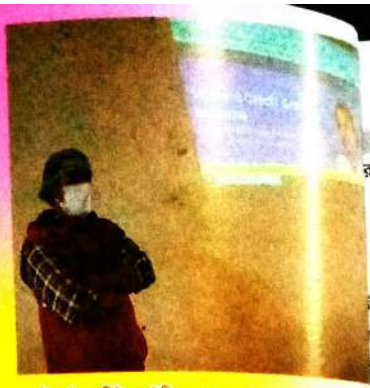

স্টুডেন্ট ক্রেডিট কার্ড বিষয়ক আলোচনায় ড. নীলাদ্রি দাস।

NCC ও NSS যৌথ উদ্যোগে এডুকেশনাল ক্যারাভান: বক্তা অধ্যাপক শ্রী কৃতিমান বিশ্বাস মহোদয়।

NCC ও NSS যৌথ উদ্যোগে এডুকেশনাল ক্যারাভান:

রম্যরচনা)

একটি অতি অদ্ভুত মৌলিক পদার্থের পরিচয়

ড. রঞ্জিত কুমার সরকার (সহযোগী অধ্যাপক, অর্থনীতি বিভাগ ও বাণিজ্য বিভাগ)

বর্ত্তমান কলেজ আমার কর্মজীবনের বেশ কয়েক বছর পূর্বে "দিশারী"র পাঠকবর্গকে একটি অতি অদ্ভুত মৌলিক পদার্থের সঙ্গে পরিচিত করিয়েছিলাম। তারপর বিগত কয়েক বছরে নানা সামাজিক-রাজনৈতিক- অর্থনৈতিক-জ্ঞানিক ও বিনোদনিক প্রতিঘাতের পলে মৌলিক পদার্থটির প্রস্তুতপ্রণালী ও ভৌত এবং রাসায়নিক ধর্ম্মের বেশ কিছু পরিবর্ত্তন ঘটায় সেই মৌলিক পদার্থটির সঙ্গে "দিশারীর" বর্ত্তমান পাঠকপাঠিকাবর্গের পরিচিতি ঘটানোর য়োজন বোধ করায় এই লেখার অবতারণা।

বেশ কিছুকাল পূর্ব থেকেই একটি অতি অদ্ভুত মৌলিক পদার্থের বিপুল প্রকাশ সারা বিশ্বেই কমবেশী খা যাচ্ছে এটা অতি অদ্ভুত মৌলিক পদার্থটির নাম Educated Unemployed বা শিক্ষিত বেকার।

সমাজবিজ্ঞানীদের মতে এর রাসায়নিক সংকেত EU এবং যোগ্যতা শূন্য।

াপ্তিস্থান :- এটি পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই অল্প বিস্তর পাওয়া যায়, তবে ভারতবর্ষে এটি বহুল পরিমানে পাওয়া য়, বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে।

স্তুন প্রণালী : শিক্ষা বিজ্ঞানীগণ এর যে প্রস্তুত প্রণালীর কথা বলেছেন, তা হল নিম্নরূপ:

বিদ্যার্থী বা পড়ুয়া" নামে এক প্রকার কচি আকরিককে একটি বহুকক্ষ বিশিষ্ট চুল্লীতে প্রথমে প্রবেশ করানো হয়। ী প্রধানতঃ চার রকমের - প্রাথমিক স্কুল (Primary School), মাধ্যমিক স্কুল (Secondary School) লেজ বা মহাবিদ্যালয় (College) এবং বিশ্ববিদ্যালয় (University) বেশ কয়েক বৎসর পূর্ব থেকে choolage (10+2Class) একটি বিশিষ্ট চুল্লীর উদ্ভাবন সারা ভারতেই ঘটেছে।

এই সকল চুল্লীর ভিতরে 'বিদ্যার্থী' বা "পড়ুয়া" নামে আকরিককে "জ্ঞান বা Knowladge" নামে ক প্রকার ভারী পদার্থের সঙ্গে শিক্ষক ও শিক্ষার্থী মহাশয়গণের সাহায্যে পর্যায়ক্রমে বেশ কয়েক বৎসর ভালভাবে ক্রিয়া ঘটানো হয়। বিভিন্ন পর্যায়ে বিক্রিয়ালব্ধ পদার্থকে 'প্রশ্নপত্র" (Question paper) নামক এক ধরনের ল্টার কাগজে বারবার ছাঁকা হয়। বর্তমানে মাধ্যমিক স্কুলের চুল্লীগুলিতে "Unit Test" নামে এক প্রকার বিশেষ দ্ধতিতে নিরন্তর সারা বৎসর ধরে একে পরিশুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়। কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় চুল্লীগুলিতে র্তমানে Internal assesment test বা আভ্যন্তরীণ মূল্যায়ণ এবং মৌলিক পরীক্ষা বা Viva নামে বিশেষ র এক প্রকার পদ্ধতিতে একে আরও পরিশুদ্ধ করে নেওয়া হয়। এই ভাবে বেশ কয়েক বৎসরকাল বিক্রিয়ার রে লব্ধ পদার্থকে বাজারে Educated Unemployed বা EU নামে ছাড়া হয়।

শিষ্ট্য বা ধর্ম : প্রত্যেক মৌলিক পদার্থের মত এরও দুই প্রকার ধর্ম আছে – ভৌতধর্ম ও রাসায়নিক ধর্ম।

ৌতধর্ম :- 1. পূর্বে EU ছিল পাইরোসিনেমাটিক এবং ভিডিয়োটিক। অর্থাৎ সিনেমা ও ভিডিও এর প্রতি এদের কর্ষণ ছিল প্রবল। কিন্তু বর্তমানে সিনেমা ও ভিডিও তেমন জনপ্রিয় বা চালু না থাকা ইহারা "Smart Pho-

netic" "Schoolage নামক বিশিষ্ট চুম্বকত্বে" বা স্মার্ট ফোনটিকে অর্থাৎ স্মার্ট মোবাইলএর প্রতি এ
আকর্ষণ খুব প্রবল। বিশেষ করে মোবাইলে Selfie তোলা, ভিডিও করা এবং সঙ্গীত এর প্রতি টান ভীষণ প্রব
Selfie তোলার জন্য এরা চলন্ত ট্রেনের সামনে নিজের জীবন বিসর্জন দিতেও প্রস্তুত থাকে। আবার অনেক
পাহাড়ের খাড়া কিনারে Selfie তুলতে গিয়ে জীবন বিসর্জন পর্যন্ত দিতে পারে।

2. EU সাধারণ তরল পদার্থে অতি সহজে দ্রবীভূত না হলেও "Fashion" নামক এক প্রকার তরল পদ
অতি সহজেই দ্রবীভূত হয়। দ্রুত গতিতে মাথায় হেলমেট না পরেই রাস্তায় (ভাল বা খারাপ উভয় ক্ষেত্রেই) বা
চালানো এদের অন্যতম "Fashion"। তা করতে গিয়ে কোন কোন সময় দুর্ঘটনা ঘটিয়ে নিজের জীবন অকা
বিসর্জন দিতে পারে।

3. EU এর কিছু কিছু "Istope" আছে, যাদের বাহ্যিক গঠন অনেকটা হিপির মতন।

4. নানা রকম ডাক্সি মারা এবং Sticker লাগানো এবং ছেঁড়া -ফাটা জিনসের জামাকাপড়ের প্রতি EU
আকর্ষণ খুবই প্রবল।

5. EU একটি অতি দাহ্য পদার্থ এবং অতি সহজেই দহনে সহায়তা করে।

রাসায়নিক ধর্ম : রাসায়নিক ধর্মগুলি বিক্রিয়ার সমীকরনের মাধ্যমে বলা হল :

1. EU + চাকুরীর চেষ্টা = হতাশা।
2. EU + Backing Acid (নগদ অর্থ) = Employed
3. EU + ব্যাঙ্কিং ঋনাইড + (বিশেষ Catalyst বা অনুঘটক) = ব্যবসা + লালবাতি
4. EU + Teaching Acid = টিউশনী বা আংশিক সময় চাকরী। m + Q ক্যালরি
5. EU + পলিটিক্যাল বোমাইড = Meeting + Beating + Bombrig (ইহা একটি ভীষণ
উৎপাদক বিক্রিয়া)

ব্যবহার : স্বার্থবান রাজনৈতি নেতারা EU কে নিজেদের কার্যোদ্ধারে বহুল পরিমাণে ব্যবহার বা অপব্য
করেন। রাজনৈতিক নেতাদের প্রতি EU এর আকর্ষণ ও অতি প্রবল।

উপসংহার : EU এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমানে প্রাণশক্তি রয়েছে। এদেরকে কোন সুনিয়ন্ত্রিত পদ্ধতিতে ব্য
করলে দেশকে উন্নতির পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া যাবেই বলে সমাজ বিজ্ঞানীগণ-শিক্ষাবিজ্ঞানীগণ এবং রাজনৈ
বিজ্ঞানীগণ দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করেন। সুখের কথা, আমাদের ভারত সরকার ও পশ্চিমবঙ্গ সরকার এই অদ্ভুত ধর্
মৌলিক পদার্থটিকে সুষ্ঠভাবে দেশ তথা রাজ্যের উন্নতির কার্যে ব্যবহার করার জন্য নিরন্তর প্রচেষ্টা চা
যাচ্ছেন। এই প্রচেষ্টা সফল ও সুন্দর হোক এই কামনা করি।

*"আমাদের দেশেও পুঁথিকে মনের রাজা না করিয়া মনকে পুঁথির উপর আধিপত্য দিবার উপায় একটু বিশেষ
ও উদ্যোগের সহিত সম্পন্ন করতি হইবে।"*

– রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

মিষ্টি বন্ধুর গল্প

তিথি ঘোষ
দর্শন অনার্স, (দ্বিতীয় সেমেস্টার)

রাস্তার ধারে একটা গাছ সবুজ পাতায় ছেয়েছিল। যেন সবুজ গালিচা। পাতাগুলো বাতাস এলে খুব মজা পেত আর হেলেদুলে খেলা করতো। একদিন হঠাৎ খুব জোরে বাতাস এলো খেলতে খেলতে একটা পাতা টুপ করে ছিঁড়ে নিচে পড়ে গেল। বাতাস খুব জোরে বইছিল তাই পাতাটি কোনো ভাবেই গাছের নীচে থাকতে পরছিল না। সে মনে মনে বাতাস আজ আতাস আমাকে উড়িয়ে নিয়ে যাবে। গাছের নীচে পড়েছিল একটি মাটির ঢেলা। সে পাতায় মনের কথা বুঝতে পারলো। সে ধীরে ধীরে পাতার কাছে এসে বলল তুমি ভয় পেয়ো না। বাতাস তোমাকে উড়িয়ে নিতে পারবে না। আমি তোমার উপর বসে তোমায় ধরে রাখবো। মাটির ঢেলার কথায় পাতায় ভয় কিছুটা দূর হল। মাটির ঢেলা পাতার উপর বসল। তাই বাতাস আর পাতাকে উড়িয়ে নিতে পারল না। কিছুক্ষণ পরেই হঠাৎ করে বৃষ্টি শুরু হল। বৃষ্টি শুরু হতেই মাটির ঢেলা মনে মনে ভাবল বৃষ্টির জন্য আজ আমি হয়তো গলেই যাবো। পাতা তখন মাটির ঢেলার কথা বুঝতে পারলো। সে মাটির ঢেলা কে বলল তুমি একটুও চিন্তা করো না। বৃষ্টি তোমার কিছুই করতে পারবেনা। আমি তোমাকে ঢেকে রাখবো অমনি পাতা গিয়ে মাটির ঢেলা কে বৃষ্টি থেকে আড়াল করে রাখল। বৃষ্টি মাটির ঢেলাকে গলাতে পারল না। এবার মাটির ঢেলা পাতাকে বলল আজ থেকে আমরা বন্ধু। আমরা একজন অন্যজনকে সাহায্য করছি বলেই আজ আমরা দুজনেই বেঁচে আছি। এখন থেকে আমরা সব সময় একে অপরকে সহায্য করবো। পাতা মাটির ঢেলার কথা শুনে খুশি হলো, সেই থেকে তারা দুজন বন্ধু এবং সব সময় একে অন্যকে সাহায্য করত। সম্পর্ক গুলো অনেকটা এই গল্পের পাতা আর মাটির ঢেলার মতো। বিপদে একে অপরের মনের কথা না বলার আগেই বুঝতে হবে যাতে বিপদ আসার পরে সেটা সঠিকভাবে মোকাবিলা করা যায়। শুধু সুখেই নয়, দুঃখেও বন্ধুর পাশে থাকতে পারলেই সেই সম্পর্ক হবে অনেকটা আগুনের প্রচন্ড তাপে পুরে খাঁটি সোনার মতোন ....। তবেই তো বন্ধুত্ব...তাই না ?

সেই তাবিজটা

রৌমিক প্রামানিক

ইতিহাস (অনার্স) প্রথম বর্ষ

হঠাৎ প্রচন্ড ঝটাপটির শব্দে আমাদের সকলের ঘুম ভেঙে গেল। তাড়াতাড়ি লাইট টা জ্বাল দেখি বিছানায় আতঙ্কগ্রস্থ হয়ে কাঁপছে টনি। আমি জিজ্ঞাসা করলাম

– "কি হলো ? এমনি করছিস কেন ?"

– "আমি জানতাম সে আসবেই"– টনি বললো। ততক্ষনে রিকু ও রিতম উঠে বসেছে।

আমি বললাম – "কে আসবে ? কার কথা বলছিস তুই ?" টনি আঙুল তুলে দেখা ভেন্টিলেটরের দিকে। দেখলাম একটা কালো রংয়ের বাদুড়, কদাকার দেখতে, কর্কশ শব্দে এদিক ও দেখছে।

আমি বললাম –"হ্যাঁ তো বাদুড়, তো হোলোটা কি ?" এবার রিতম বলল– "আরে জানলাটা খোলাছিল বাদুড়টা এসে ঢুকে পড়েছে।"

আমরা সবাই বাদুড়টা ঘর থেকে বার করলাম।

রিকু লক্ষ্য করল টনির গালে লালচে চিঁরে দেওয়ার দাগ। তা দেখে টনি আরো ঘাবড়ে গেল।

সকালে চা খেতে খেতে টনি বলল – গতকাল আমি জঙ্গলে ঘোরার সময় একা একটু দুরে আদিবাসীদের বসতিতে গিয়েছিলাম। সেখানে এক তান্ত্রিকের সঙ্গে দেখা হলো। তাকে বলেছিলা "আমার কোন কাজে সফল না হওয়ার কথা। সে আমাকে এই তাবিজটা দিয়েছে। তাতে আমার মনোস্ক পূর্ণ হবেই"– রিতম বললো – "এই যুগেও তোরা তাবিজ বিশ্বাস করিস ? যত্তোসব তোরা বস জঙ্গলে যাচ্ছি"–

আমরা চারজন নভেম্বরের ছুটিতে উত্তরাখন্ডের 'করবেট পার্কে' বেড়াতে এসেছি। আমরা সরকারি বাংলোয়। কিন্তু টনির আতঙ্ক কিছুতেই কাটাতে পারছিনা। লাঞ্চের পর আমরা চারজনেই জ ঘুরতে বেরোলাম।

রিকু, টনিকে বলল –"তুই তাবিজটা কখন পেলি ?" – কাল বিকেলে। সেই তান্ত্রিকই দিয়েছে। দেবার সময় সে বলল– "বাবু সাব, এই তাবিজটা একটা বাদুড়ের মেরুদন্ডের হাড় থেকে তৈ গত অমাবস্যায় তাকে মেরে হাড়টি বের করে এই তাবিজটা তৈরি করেছি। তবে সাবধান, ঐ বাদুড়ের

সঙ্গী হয়তো তোর খোঁজ করতে পারে।

ঘাবড়াস না। সব ঠিক হয়ে যাবে "–

তা শুনে তাচ্ছিল্য করে রিতম বললো –"ঐ জন্যেই বাদুড়টা কাল এসেছিল, তোকে খোঁজ করতে। হারামি"।

সূর্য্য ডোবার আগেই আমরা জঙ্গলের বাংলোয় ফিরলাম। রাত্রে ঘুমাতে যাওয়ার আগেই রিতম বললো– "তোরা ঘুমা, আমি জেগে পাহাড়া দেব" আমরা সবাই সায় দিলাম।

পরদিন সকালে রিকু আমাকে জাগিয়ে তুলে বলল – "টনিকে দেখতে পাচ্ছিনা ?" সারা বাংলো খুঁজলাম পেলাম না"–

আমি রিতম কে ধাক্কা মেরে ওঠালাম, বললাম– "তুই টনিকে শেষ কখন দেখেছিস ?"–

সে বলল –"আমি তো কিছুক্ষন হল চোখটা বন্ধ করেছি। তখন তো ছিলই"–

আমার বুঝতে বাকী রইলো না যে, সে তো বোটানির ছাত্র, হয়তো কোন নমুনার খোঁজেই বেরিয়েছে। আমরা চা খেতে যাবো এমন সময় আমাদের গাইড ছুটে এসে বললো – 'আপকা দোস্ত কো একসিডেন্ট হো গয়া, জলদি আইয়ে"–

উর্দ্ধশ্বাসে ছুটলাম, অনেকটা দূরে এক খাদের ধারে বাংলোর জিপটা একটা গাছে ধাক্কা মেরে ল্টে গেছে। চাকাটা টনির পায়ের উপর রয়েছে। সবাই মিলে গাড়িটা তুলি টনিকে বের করলাম। হাতে ও পালে আঘাত পেয়ে রক্ত ঝরছে। তাকে বাংলোয় নিয়ে আসার সময় আমি লক্ষ্য করলাম আমাদের মাথার পর বেশ কয়েকটা বাদুড় প্রচন্ড কর্কশ শব্দে চিৎকার করে উড়ছে। যতো টা পথ আমরা গিয়েছি ঠিক তোটাই সে গিয়েছে। ব্যাপারটি রিতম নিজেও লক্ষ্য করেছে। সে তখন টনির ডান – হাতে থাকা তাবিজটা ড়ে ফেলল। তার পর যে গাড়িতে আমরা বাংলো যাচ্ছিলাম সেই গাড়ি থেকে নেমে গাছগুলির মাঝে তে ছুঁড়ে দিল। কিছুক্ষনের মধ্যে দেখলাম বাদুড় গুলি আর চিৎকার করছে না। তারা তাবিজের আশে শেই উড়তে লাগলো।

কয়েক দিনের মধ্যে টনি সুস্থ হয়ে উঠল, আর আমরাও রামপুরহাট ফিরলাম। কিন্তু "করবেট র্কের" ঝলমলে স্মৃতির চাইতেও বাদুড়ের ঘটনার রহস্য আজও ধোঁয়াশার মতো রয়ে গেল।

সৌরভের স্বপ্ন

শ্যামাশ্রী মজুমদার
রাষ্ট্রবিজ্ঞান অনার্স (চতুর্থ সেমেস্টার)

রাত তিনটে বাজে। বিছানা থেকে উঠে গিয়ে জানলাটা খুলে দিল সৌরভ। চাঁদের জ্যো আলো ঘরে এসে পড়ল। কখন থেকে শুয়ে আছে ঘুমই আসছে না। একে তো বীভৎস গরম তার ওপ দুশ্চিন্তা ঘুরপাক খাচ্ছে মাথার মধ্যে। কাল তো আবার সকাল সকাল উঠতে হবে কোলকাতা যা জন্যে। আগামী পরশু ওর NEET এর পরীক্ষা আছে। পাশের ঘরে সবাই তখন গভীর ঘুমে আ সবাই বলতে মা, বাবা এবং ছোটো বোন সুনন্দা। তার বাবা পেশায় একজন অটোচালক আর মা গৃ এবং ছোটোবোন একাদশ শ্রেণীতে পড়ে। অভাবের সংসার।

এবার গরমের সাথে শুরু হল মশার উপদ্রব। গরম সহ্য করা যায় কিন্তু মশার উপদ্রব সহ্য খুব শক্ত, সৌরভ বিছানা ছেড়ে উঠে গিয়ে বারান্দায় পায়চারি আরম্ভ করল। মনে পড়তে লাগল হ কথা। এই তো কিছুদিন আগেও তার জীবনে ছিল আনন্দ। কিন্তু উচ্চমাধ্যমিকের পর যেন সব অন্ধ হয়ে যায়। তার জীবনের আনন্দটুকু কোথায় যেন হারিয়ে গেল। ছোটো থেকেই স্বপ্ন ছিল ডাক্তার গরীবের বিনামূল্যে চিকিৎসা করা, মানুষের সেবা করা। তাই সে শুধুমাত্র মেডিক্যাল এর জন্য প্রস্তুতি থাকে। কলেজেও ভর্তি হয়নি। দিনের অধিকাংশ সময়টুকু এতদিন নিজের পড়ার জন্য দিয়েছে। কি পর তিনবার পরীক্ষায় বসা সত্ত্বেও ডাক্তারিপড়ার সুযোগ হয়নি। এর জন্যে অনেক অপমান, লাঞ্ছনা করতে হয়েছে তাকে। ইদানিং তার বাড়ি থেকে বেরোতেও ভয় হয়। বন্ধুদের কাছে যেতেও ভ তাকে দেখলেই লোকে বলে কী রে, এবারও সুযোগ পেলিনা ? তোর বন্ধুরা তো গ্র্যাজুয়েশন পা গেল। অনেকে আবার বলে কি রে বাবার টাকায় আর কতদিন বসে বসে খাবি ? এবার তো অন্তত একটা কর, আর কতদিন এভাবে চালাবি ? বাড়িতেও মাঝে মধ্যে অনেক কথা কাটা-কাটি হয়। সৌ মাঝে মধ্যে মনে হয় এভাবে বেঁচে থেকে কি লাভ ? এর থেকে মরে যাওয়া অনেক ভালো। প পরক্ষণেই মনে হয়, সে এতটাও কাপুরুষ নয় যে লোকের বাজে কথায় নিজের জীবন শেষ করে ফে সবাই তাকে নিয়ে হাসাহাসি করে, সবাই তাকে অকেজো, দুর্বল ভাবে। সে কি বোঝেনা তার বাবা তার মায়ের দুঃখ ? সে তো সবই বুঝতে পারে। কিন্তু তার যে বিশ্বাস আছে সে পারবে। সে পারবে স্বপ্ন পূরণ করতে। সে পারবে সমাজের অবহেলিত, দরিদ্র, লাঞ্ছিত, শোষিত মানুষদের পাশে দাঁ

তার বিশ্বাস রাতের পর রাত জেগে পড়াশোনা বৃথা যাবেনা। সে একদিন সবাইকে বুঝিয়ে দেবে যে সেও পারে তার স্বপ্নপূরণ করতে। এসব কথা ভেবে সে তার মনকে শক্ত করে।

ক্রমে ঘড়িতে ভোর পাঁচটা বেজে ওঠে। সৌরভের খেয়াল হয় এবার তাকে তৈরী হতে হবে। সে চোখের জল মোছে। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে কখন যে চোখ দিয়ে অঝোরে জল পড়তে লেগেছে সে বুঝতেই পারেনি।

যাইহোক, আটটায় ট্রেন। কিন্তু তাকে বাড়ি থেকে রওনা দিতে হবে সাতটায়। স্টেশন তার বাড়ি থেকে ৭ কিমি দূরে। এবার সে তৈরী হয় এবং রওনা হয় স্বপ্নের উদ্দেশ্যে। স্বপ্ন ছুঁতেই হবে তাকে।

"গানের তরী"

সাক্ষর ব্যানার্জী
(সংস্কৃত বিভাগ) ষষ্ঠ সেমেষ্টার

আমাদের পরিবারে সঙ্গীতসাধনার রীতি রেওয়াজ রয়েছে। খুব ছোটবেলা থেকেই তাই রেডিওতে টিভিতে শোনা যে কোন গান খুব সহজে শুনে শুনে গুণ গুণ করে গাইতাম, পছন্দের শিল্পীদের গানের প্রতি স্বাভাবিক আকর্ষন বোধ করতাম, আমার গান গাওয়ার শুরু এক সাহিত্যসভায় আর তা অনুষ্ঠান, পূজা-পার্বনে বা ঘরোয়া জলসায় গান গাওয়া আমার অভ্যেসে দাঁড়িয়ে গেল, বয়স কম তাই অনেকে প্রশংসা করতেন।

গান গাওয়ার ক্ষেত্রে আমার সহজাত ভালোবাসা রয়েছে, আসলে গানের প্রতি অদ্ভুত আকর্ষণ অনুভব করি, গানগাওয়ার কারনে নানা ছোট ছোট ঘটনা আমার জীবনকে আশীর্বাদের মতো ভরিয়ে রেখেছে।

ছোটবেলায় না শিখেই গান গাইতাম কিন্তু বড় হওয়ার সাথে সাথে প্রথাগত শিক্ষার প্রয়োজন উপলব্ধি করেন আমার বাবা মা ক্লাস এইট (VIII) থেকে গান শেখা শুরু হয় - তখন আর শুনে শুনে শেখা নয়, রীতিমত ব্যাকরণ মেনে, স্বরলিপি অনুযায়ী গান।

একবার ট্রেনে একজন শিল্পী গান গাইছিলেন, খুব ইচ্ছে আমিও গান গাইবো কিন্তু সাহস পাচ্ছিনা আর ট্রেনের অত মানুষের সামনে লজ্জাও করছিল, কীজানি কে কী ভাববেন, সেই শিল্পী হাসিমুখে আমার অনুরোধ মাইক্রোফোন তুলে দিলেন, শুরু করলাম গান, গানের শেষে হাততালি দিয়ে উৎসাহ ভরিয়ে দিলেন সবাই সেই শিল্পী সবার সাথে আমার আলাপ করালেন 'পথের শিল্পীশিল্পী' বলে মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করলেন - আনন্দে ভরে গেল আমার মন। এই ঘটনার পরেই আমি প্রথাগতভাবে গান শেখা শুরু করি।

স্কুলের অফ পিরিয়ডে একদিন ইংরাজী স্যার বললেন-'আজ আর একটুও পড়াশোনা নয়' শোনামাত্র সবাই আনন্দে হৈ হৈ করে উঠলাম, সত্যিই তো একঘেয়ে রুটিনের পড়াশোনা থেকে রোজ কারই বা ভালো লাগে আমরা গল্পশোনার আনন্দে মশগুল, এদিকে স্যার বললেন-"কে পারিস করতো দেখি।" বন্ধুরা সবাই আমার সামনে এগিয়ে দিল "স্যার ও ভালো গান গায়।" দুরু বুকে ধরলাম কবিগুরুর গান। স্যার খুব মন দিয়ে শুনছিলেন, শেষ হলে বললেন, পরের দিন বাবা

খা করতে বলিস। সারারাত চিন্তায় ভয়ে ভালো ঘুমই হলো না। স্কুলে বাবা দেখা করলেন, টিচারস মে ছড়িয়ে গেল গানের কথা, মাঝে মাঝে ডাক পড়তো গান শোনানোর জন্য।

একদিন স্যার ডেকে বললেন, স্কুলের আটানব্বইতম প্রতিষ্ঠা দিবসে আমাকে "বাউল গান" হতে হবে। কিন্তু আমি বাউল গানের বিন্দুবিসর্গ জানিনা মা বাবার নিরন্তর উৎসাহ, আর স্যার ম্যাডামদের রলস প্রয়াস, রোজ একটু একটু গানগুলি তুলতে পারলাম, ভেসে ওঠে সেই দিন ২০০৪ সালের ৩রা ফ্রুয়ারী বিশাল বড় মঞ্চ বড় বড় লাইট, অসংখ্য দর্শক, স্যার-ম্যাডাম-আমার বন্ধুরা বাউলবেশে কতারা হাতে মঞ্চে উঠলাম, শেষ গান আমার "তোমায় হৃদয়মাঝারে রাখবো, ছেড়ে দেবোনা"। সেই ক্ষেবেলার স্মৃতি আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ প্রাপ্তি। কান্নার মধ্যে, চোখের জলের মধ্যেও যে এতো আনন্দ মা থাকে সেদিন বুঝেছিলাম অজস্র প্রশংসা পেলেও মনে থাকবে এক বয়স্ক ভদ্রলোকের হাজারটাকার ষ্কারের কথা নাহ, সেই টাকা আমি নিইনি: গুনার স্নেহমাখা হাতের স্পর্শ আমার মাথার উপর এটাই খষ্ট আমার আমার জীবনের স্মরণীয় দিন। তারপর মাধ্যমিক উচ্চমাধ্যমিকের গন্ডী পেরিয়ে কলেজে নাম। কলেজের অনুষ্ঠানে গান গাইতে ভালো লাগে আমরা, গানের প্রতি ভালোবাসায় আমার মা মার অবদান সবথেকে বেশি, তবলায় সঙ্গত বা নানা জায়গায় নিয়ে যাওয়া ওঁরা ছাড়া সম্ভব হতো না মায় অনেকে "বাবলা বাউল" বলে ডাকেন- আমার ভালো লাগে গান আমাকে শান্তি দেয়, যখনই াস লাগে বা মন খারাপ থাকে আবার যখন আনন্দ হয়, তীব্র খুশি-গানই আমার অনুভূতি প্রকাশের ধ্যম, আমার মুক্তি, গানে গানেই থাকতে চাই আমি।

৮) Class-VII নাগাদ দেখলাম জীবনটা আস্তে আস্তে Simple থেকে Complex হয়ে C
pound র দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। তার আমিও আস্তে আস্তে and, or, when, which র
আটকা পড়তে লাগলাম। মনে হল জীবনটা আসলে মস্ত বড় ? শুধু Question আছে 'Answe
কোথায় - কে জানে !

৯) Class-IX -এ সাথে Verb এর সাথে Preposition যুক্ত হয়ে Adverb-র জন্ম দি
আমার মস্তিকের বিভিন্ন Group কে তালগোল পাকিয়ে আমার পাশ করার পথে বাঁশ Put up ক
আমিও এই বাঁশ কোনক্রমে pulled off করলাম।

১০) এর সঙ্গে জুড়ে ছিল Story Writing মানে বাংলায় যাকে বলে গল্প কিন্তু সে কথা যত অ
যায় ততই মঙ্গল। আমার English এ লেখা Story-র নাম্বার দেওয়ার সময় মাষ্টার মশাইরা
I am Sorry লিখতেন।

১১) তারপর Shelly, Shakespeare, Keats, Milton এসে আমার জীবনটা Cell এ
কয়েদীদের মত করে দিলেন, 'A Midsummer Night's Dream'; 'The Cloud' -র অ
মিলিয়ে যেতে লাগলো।

১২) আর তেমনই লাগত ইংরেজি শিক্ষকদের। শক্ত চোয়াল, ঠান্ডা চাউনি। ইংরেজিতে এমন এক
শব্দ বলতেন যেন এক একটা ধারালো তালোয়ার। একের পর এক বিষয় বুঝিয়ে চলে যেতেন
Topic এ। আর প্রতিটা Sentence -র শেষে বলতেন Full Stop যেন মনে হত তলে
আমার গলা কেটে আমার জীবনটাকেই Stop করে দিচ্ছেন।

আপনারা হয়ত ভাবছেন এত ভয়ঙ্কর স্মৃতি তবুও English কে মনে রেখেছি কেন ? ক
পরীক্ষা হলে বন্ধুদের কাছ থেকে দেখে নিয়ে Telegram লেখার স্মৃতি আজও মনে আছে। মনে
Unseen র না পারা উত্তর কল্পনা করে বানানোর কথা। আরও মনে আছে নিজের অনুভূতির জন্য
আমি ভাবতাম ইংলিশ Writing মুখস্ত করার কি দরকার ও তো Points দেওয়া থাকে। 3 টা Po
দেখেই লিখতে পারব। বাংলাতে পড়েছিলাম স্মৃতি সততই আনন্দের, কিন্তু এমন বেদনাদায়ক অ
স্মৃতি মানুষ কি কখন ভুলতে পারে ?

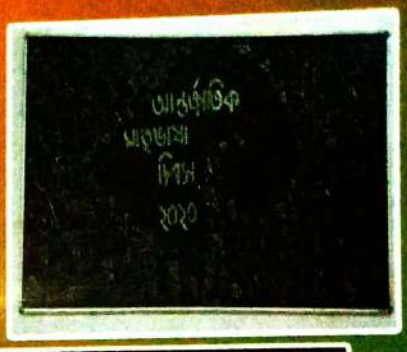

অনলাইন মাধ্যমে পঠনপাঠন : অধিবিনার আয়োজনে সংস্কৃত বিভাগ ও ইংরেজি বিভাগ।

মাষ্টারমশাই

অর্পন সেন (রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগ)

ত্রলিপি :

রুনবাবু - অঙ্কের শিক্ষক।

মলেন্দুবাবু- স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

ত্রছাত্রী- অরুনবাবু যে স্কুলের শিক্ষক সেই স্কুলের ছাত্র-ছাত্রী।

ধান শিক্ষকের রুম। শিক্ষকমশাই কম্পিউটারের সামনে বসে আছেন। টেবিলের উপর খাতাপত্র পড়ে য়েছে। এখন পড়ন্ত দুপুর। অরুণবাবু রুমের সামনে এসে]

রুণ : আসতে পারি ?

মলেন্দু : হ্যাঁ, আসুন অরুণবাবু, বসুন।

রুন : আপনি ডেকেছেন ?

মলেন্দু : হ্যাঁ অরুণবাবু অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আপনাকে জানাতে বাধ্য হচ্ছি, আমাদের স্কুল অথরিটি ঠিক রেছে যে, আপনাকে আমরা অনির্দিষ্ট সময়ের জন্য ছুটি দিচ্ছি। এই করোনার প্রভাব কমে গেলে আবার হয়.....।

রুণবাবু : [প্রধান শিক্ষক এর কথা শুনে কিছুটা অবাক হয়ে কি ? কি বলছেন স্যার...কেন মানে আমার আমার বা ছাত্রছাত্রীদের কোনো ভুল হয়েছে ?

মলেন্দু : না না .... কি বলছেন আপনি। এই স্কুলের সবথেকে প্রধান শিক্ষক এতদিন ধরে নিষ্ঠার সঙ্গে ত্র-ছাত্রী পড়িয়ে চলেছেন। আপনার হাতে কত কত ব্রিলিয়ান্ট স্টুডেন্ট দেশে বিদেশে উচ্চপদে কর্মরত, মরা আপনাকে পেয়ে সত্যিই গর্বিত।

রুন : তাহলে কি এমন হল....?

মলেন্দু : অরুণবাবু যে হারে সংক্রমন বাড়ছে আমাদের যে কোনো দিন স্কুল বন্ধ করে দিতে হবে। আর লে মেয়েদের পড়াশোনা জন্য বিকল্প ব্যবস্থা করা হচ্ছে, এখন থেকে ছাত্র ছাত্রীরা বাড়িতে বসেই স্কুলের বতীয় ক্লাস করবে অনলাইনে।

রুণবাবু : অনলাইন ....মানে সেটা কি করে ? খাতাপেন ছাড়াই ওরা অঙ্ক করবে !!

মলেন্দু : হ্যাঁ খাতাপেন ছাড়াই বটে মোবাইল কোন বা ল্যাপটপ এর মাধ্যমে।

অরুন : ফোনে ....(তাড়াতাড়ি করে পাঞ্জাবির পকেট থেকে কি প্যাড ফোন বের করে স্যারকে বলেন) দেখুন না স্যার আমার এই ফোনটাই হবে কি না।

বিমলেন্দু : অরুণবাবু আপনি একটু শান্ত হোন (হাত দিয়ে মোবাইলের দিকে ইশারা করে বলেন) এই কি প্যাড ফোনে কিছু হবে না। স্মার্ট ফোন লাগবে, পারবেন জোগাড় করতে।

অরুন : [স্যারের কথা শুনে একমনে অন্যদিকে তাকিয়ে ভাবেন জলের অনুকূল, প্রতিকূল, ট্রেনের গতি পিতা পুত্রের বয়সের জটিল ধাঁধার অনুপাত, সম্পাদ্য উপপাদ্য, xy2 এর নকশা থেকে ক্যালকুলাস জটিল সমাধান তাঁর কাছে জল ভাত। কিন্তু এই বয়সে নতুন করে স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ চালানো করে, যদিও বা শিখে যান এগুলো কোনোটাই কেনার সামর্থ্য তাঁর নেই। গত বছরই জমি জমা বেচে দিয়ে মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। এসব ভাবতে ভাবতে তার চোখ ভিজে ওঠে]

বিমলেন্দু : অরুণবাবু কি ভাবছেন শুনুন আমি অনেক লড়াই করেছি আপনার জন্য হায়ার অথরিটির কিন্তু ওনারা কিছুতেই রাজি নন। নতুন নতুন প্রশিক্ষক আনছেন যাঁরা এই বিষয়ে পারদর্শী। মন খারাপ করবেন না। সব কিছু নরম্যাল হলে আমি আবার আপনার জন্য কথা বলে দেখবো।

অরুন : কিন্তু স্যার আমি যে আর অঙ্ক ছাড়া কিছুই জানি না। আর আমার ছাত্রছাত্রীরা আমার সন্তান ওদের ছেড়ে আমি কি করে থাকবো।

বিমলেন্দু : আমার হাতপা বাঁধা অরুণবাবু। নমস্কার আপনি তাহলে এবার আসুন।

অরুণবাবু : (স্কুল থেকে বেড়িয়ে একবার পিছন ফিরে দেখেন এতবছরের এতস্মৃতি একনিমিষে থেকে অতীত বেশি গাঢ় হয়ে ওঠে, ঘামতে ঘামতে ঘরে গিয়ে স্ত্রীর সামনে আবেগাচ্ছন্ন হয়ে বলেন) কি সংক্রমন এলো গো, চক ডাস্টার খাতা পেন সব ব্রাত্য হয়ে গেল। আর কোনো দাম রইলোনা, কোনো দাম রইলনা।

কিছুদিন পর

অরুন : (আজ শিক্ষকদিবস সকালথেকেই অরুণবাবু মনখারাপ মনে মনে ভাবতে থাকেন প্রতিবছর ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে কি সুন্দরই না কাটে এই দিন টা, আর আজ সত্যিই বোধ হয় এই অনলাইনে তিনি বড্ড বেমানান। এমন সময় হঠাৎ একদল ছেলে এসে হাজির অরুন বাবুর বাড়ির উঠোনে ডাকাডাকি]

ছাত্র ছাত্রী : স্যার ও স্যার স্যার,

অরুন : কে ? কারা এলিরে এখন ? (ঘর থেকে বেরিয়ে দেখেন, কিছু ছাত্রছাত্রী এসেছে। দেখে ওঠেন।) একি তোরা!!

ভূগোল বিভাগের দেওয়াল পত্রিকা উদ্বোধন : অধ্যক্ষ ড. নুরুল ইসলাম, ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী, ড. রঞ্জিৎ সরকার, [illegible] মলিন কুমার সেনগুপ্ত মহোদয়।

আগামী : নির্মীয়মাণ কলেজ বিল্ডিং।

হীরালাল ভকত কলেজ - মাল্টিজিম সেটআপ।

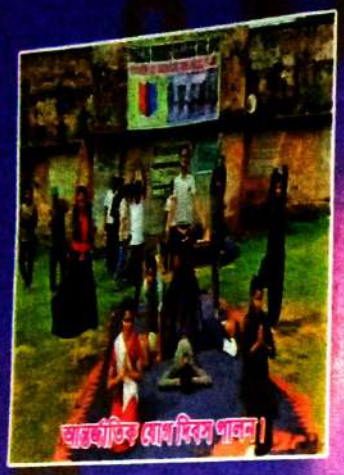

আন্তর্জাতিক যোগ দিবস পালন।

রক্তদানে ব্রতী অধ্যাপিকা শ্রীমতী সুচিত্রা না

NCC এর উদ্যোগে রক্তদান শিবিরের আয়োজন।

রক্তদানে ব্রতী অধ্যাপক শ্রী বিশ্বনাথ পাহাড়ী

ছাত্রী : কেমন আছেন স্যার ? আমাদের ছেড়ে আপনি থাকতে পারছেন তো ! কই আমরাতো পারলাম আজকের দিনে আপনার কাছে না এসে থাকতে ।

ণবাবু : (ভেতর থেকে একটা মাদুর এনে দিয়ে বলেন) আয় আয় এইখানে বিছিয়ে দিয়ে বোস। কি হেসে) বলেন তোরা তোদের স্যারকে চিনলি না রে। তোদের ছাড়া কি আমি ভালো থাকতে রে । কিন্তু তোদের স্যারের যে এতটুকুই ক্ষমতা। এই অনলাইনেরযুগে আমার এই পুরনো ফোনে কি র পড়াবো বলতো। আমার জন্য চক ডাস্টারই ঠিক আছে। তোরা বরং কোথাও কখনো আটকালে ার কাছে এসে দেখে যাস। আমার ওসব করোনা টরোনার ভয় নেই। (বলে ডুকরে কেঁদে ওঠেন অরুণ)

ছাত্রী : আপনিও তো আমাদের চিনলেন না তাহলে স্যার (বলে ছাত্র ছাত্রীরা সবাই মিলে স্যারের পায়ে া ঠেকায় আর বাক্স থেকে নতুন স্মার্টফোন খুলে স্যারের হাতে রাখে এবং সমস্বরে বলে ওঠে।) পনার বকুনি ছাড়া অঙ্ক যে আমাদের মাথায় ঢুকবেনা স্যার।

যুগপৎ

ইন্দ্রনীল মণ্ডল
সহকারী অধ্যাপক, ভূগোল বিভাগ

(১) অসহ্য দুঃখের ভিতর দিয়ে গিয়েও মনের মধ্যে আনন্দ জাগে। নিজের ভিতর আর বাই
অনন্ত আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে। সেই সুবৃহৎ পরিসরে অন্যের দুঃখটাও নিজের মধ্যে অন্তরায়িত হয়ে
তখন নিজের বাড়িও মিউজিয়ামে পরিণত হতে পারে, যেখানে অতীত, বর্তমান আর ভবিষ্যতের
অনুসঙ্গ একসঙ্গে এঁটে যাবে। আবার নিজস্বতাও বজায় থাকবে। আত্মস্থ এবং সমাহিত হবে তার প্র
শেষমেশ শুধু ভালোবাসা দিয়ে ভালোবাসার মানুষকে ভালো রাখা যায় না। কেবল দুঃখ দেওয়া আর
পাওয়া একমাত্র আমাদের কাজ হতে পারে না। তাই সরে আসতে হয়, সরিয়ে দিতে হয়। যে বয়স
আমরা ঐহিক স্মৃতিযাত্রায় যেতে পারি তার সবটুকু নিজের মত করে গড়ে নিতেও পারি। সেখানে
বন্ধু,আকাঙ্খা, মিলন, বিচ্ছেদ, নেশা, রোগ, ওষুধ, মৃত্যু সব থাকবে। জীবনের পরিপূর্ণ উদযাপন। কে
কোনো অবজ্ঞা নেই, অবহেলা নেই। আর সেগুলো ধরা থাকবে অদৃশ্য লাইট, ক্যামেরা, অ্যাকশানে। মা
একখানি বায়োপিকের স্যুট। আমরা নিজেরাই তার পরিচালক।

(২) আচ্ছা, সব মানবিক সম্পর্কের কি নাম থাকতেই হবে প্রত্যেক সম্পর্ককে দেওয়ার মত
নির্ধারিত অত নাম বোধহয় আমাদের নেই। কোনো ভাষায় অতগুলো শব্দ বা শব্দবন্ধ নেই, যে সব সম্
নাম দিয়ে কুলিয়ে উঠতে পারবে। যদিওবা জোর করে টেনেটুনে একটা নাম নাহয় দেওয়া গেল, কিন্তু
সংজ্ঞায়িত করা অসম্ভব। সেই সংজ্ঞা সর্বজনগ্রাহ্য নাও হতে পারে। অপরদিকে যাদের সম্পর্কের নাম
হল তারা ওই নাম শুনে আল্লাদে আটখানা হবে এমন ভাবনাও বৃথা। বিজ্ঞানে যখনই কোনো সংজ্ঞা
হয় তখন কিছু জিনিস স্থির, এটা ধরে নেওয়া হয়। বিজ্ঞানের এই ভাষা সম্পর্কের ক্ষেত্রে খাটে না। আই
বিচারের রায়ে প্রথমেই কিছু পরিভাষা সম্বন্ধে পরিষ্কার করে বলে নেওয়া হয়। তারপরেও আইন
বিজ্ঞানের পরিভাষার বাইরে কিছু থাকতে পারে, থাকেওবা। 'যত মত তত পথ' যদি হতে পারে, তবে
মানুষ তত সম্পর্ক কেন নয়। এমনটা নয়তো, যে সমাজ তার সুবিধার্থে দৃশ্যমান সব সম্পর্কগুলো শ্রেণিবি
করে খোপ তৈরি করে রেখেছে! কেউ একটা খোপে বেমানান হলে সমাজ রসাতলে যাবে আগে
এমনটা ধরে নেওয়া প্রথাসিদ্ধ হয়ে গেছে। আইন অন্ধ কিন্তু সমাজ তো নয়। সমাজের চোখ সিসি
চোখ। প্রয়োজনে সচল প্রয়োজনে বিকল। এই চোখ আদপে কোনো দিন হদিস পায় না বর্ণিল ব্য
বাপনচিত্রের।

ভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাস : প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব ও সমাজ ভাবনা

কৃতিমান বিশ্বাস, সহকারী অধ্যাপক, পরিবেশ বিদ্যা বিভাগ,
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটি, বীরভূম

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় একজন জনপ্রিয় বাঙালি সাহিত্যিক। তিনি মূলত উপন্যাস এবং ছোট
লিখে খ্যাতি অর্জন করেন। পথের পাঁচালী এবং অপরাজিত তাঁর সবচেয়ে বেশি পরিচিত উপন্যাস।
ন্যান্য উপন্যাসের মধ্যে আরণ্যক, চাঁদের পাহাড়, আদর্শ হিন্দু হোটেল, ইছামতি এবং অশনিসংকেত
শষভাবে উল্লেখযোগ্য। উপন্যাসের পাশাপাশি বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রায় ত্রুটিটি ছোটগল্প, কয়েকটি
শোর পাঠ্য উপন্যাস এবং ভ্রমন-কাহিনী ও দিনলিপি রচনা করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের
চালী উপন্যাস অবলম্বনে সত্যজিৎ রায় পরিচালিত চলচ্চিত্রটি আন্তর্জাতিক খ্যাতি লাভ করে এবং
৫০ সালে ইছামতি উপন্যাসের জন্য বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের সর্বোচ্চ সাহিত্য পুরস্কার
ন্দ্র পুরস্কার লাভ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাঁচরাপাড়ার
টবর্তী ঘোষপাড়া মুরাতিপুর গ্রামে মামার বাড়িতে জন্মগ্রহন করেন। পৈতৃক নিবাস উত্তর ২৪ পরগনা
লার বসিরহাট মহকুমার পানিতার গ্রাম। তাঁর পিতামহ ছিলেন কবিরাজ এবং তিনি গোপালনগর এর
ট বারাকপুর গ্রামে কবিরাজ করতে আসতেন। তাঁর পিতা ছিলেন প্রখ্যাত সংস্কৃত পন্ডিত। পান্ডিত্য
বং কত কথার জন্য তিনি শাস্ত্রী উপাধিতে ভূষিত হয়েছিলেন। মাতা মৃণালিনী দেবী এবং বিভূতিভূষণ
ন্দ্যোপাধ্যায় পিতামাতার পাঁচ সন্তানের মধ্যে জ্যেষ্ঠ ছিলেন। পিতার কাছে বিভূতিভূষণ পাঠ শুরু করেন।
রপর নিজ গ্রাম এবং অন্য গ্রামের কয়েকটি পাঠশালায় পড়াশোনার পর বনগ্রাম ইংরেজি বিদ্যালয়ে ভর্তি
। এই বিদ্যালয়ে তিনি আবৈতনিক শিক্ষার্থী হিসেবে পড়াশোনার সুযোগ পেয়েছিলেন। ছোটবেলা থেকেই
নি মেধাবী ছিলেন এবং অষ্টম শ্রেণীতে পড়ার সময় পিতৃবিয়োগ হয়। ১৯১৪ সালে প্রথম বিভাগে
ত্রীস এবং ১৯১৬ সালে কলকাতার রিপন কলেজ থেকে প্রথম বিভাগে আই.এ.পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।
১৮ সালে একই কলেজ থেকে বি.এ. পরীক্ষায় ডিস্টিংশনসহ পাস করেন। এরপর তিনি এম.এ.
বং আইন বিষয়ে ভর্তি হয়েছিলেন কিন্তু ১৯১৯ সালে পড়াশোনা ছেড়ে দিতে হয় অর্থনৈতিক কারনে।
বর্তী সময়ে শিক্ষকতার মাধ্যমে দেশাগত জীবনে প্রবেশ করেন। এই সময় কিছুদিন গোরক্ষিনী সভার
ারক হিসেবে বাংলা, ত্রিপুরা এবং আরাকানের বিভিন্ন অঞ্চলে ভ্রমন করেন। অবশেষে তিনি গোপালনগর
রিপদ ইনস্টিটিশন স্কুলে শেষ জীবন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন। এই মহান কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ

বন্দ্যোপাধ্যায় ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে বিহারের বর্তমান ঝাড়খণ্ডের ঘাটশিলায় মৃত্যুবরণ কর

১৯২১ সালে প্রবাসী পত্রিকায় মার্চ সংখ্যায় উপেক্ষিতা নামক গল্প প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্যিক জীবনের সূত্রপাত ঘটে। ভাগলপুরে কাজ করার সময় ১৯২৫ সালে তিনি পথের পাঁচালী শুরু করেন। এই লেখার কাজ শেষ হয় ১৯২৮ সালে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রথম এবং রচনা। সাহিত্যিক সম্পাদক উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় এই লেখাটি পছন্দ করে বিচিত্রা পত্রিকায় করলে তিনি বিপুল জনপ্রিয়তা অর্জন করেন। বিখ্যাত চলচ্চিত্র পরিচালক সত্যজিৎ রায় পথের উপন্যাসের কাহিনী চলচিত্র রূপদানের মাধ্যমে তাঁর চলচিত্র জীবনের সূচনা করেছিলেন এবং এই ছবির নাম ছিল পথের পাঁচালী। এই চলচিত্রটি দেশ–বিদেশি প্রচুর পুরস্কার এবং সম্মান লাভ করেছিল। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় অপুর সংসার,অপরাজিত রচনা করেন। এবং পরবর্তী সময় সত্যজিৎ রা দুটি গল্প নিয়েও চলচিত্র নির্মাণ করেন, যা পরবর্তীকালে ভীষণ জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। পথের পাঁচালী উপ মাধ্যমে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর ব্যক্তিগত জীবনের প্রতিফলন ঘটিয়েছেন এবং পথের উপন্যাস পরবর্তী সময়ে বিভিন্ন ভারতীয় ভাষা, ইংরেজি এবং ফরাসি সহ বিভিন্ন পাশ্চাত্য ভাষায় হয়েছে।

পথের পাঁচালী শুধুমাত্র একটি উপন্যাস হয়ে থাকেনি, এর মধ্যে রয়েছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপা পল্লীগীত এবং নৈসর্গিক প্রাকৃতিক এবং সামাজিক চেতনা। পথের পাঁচালী তে শেখার কিছু নেই অনেক কিছু দেখার আছে, যা বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সুন্দর ভাবে তাঁর উপন্যাসের মধ্য দিয়ে করেছে। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় পল্লী প্রকৃতির নিসর্গ জীবন তুলে ধরেছেন, ভাষা মাধুর্যের সং মানব জীবনের অন্তর্লীন সত্ত্বার সহিত মিলে মিশে ভাবে। তাঁর পথের পাঁচালী যেন প্রকৃতির সন্তা প্রকৃতির রূপ, রস, গন্ধ গায়ে মেখে বেড়ে ওঠা অপু বাংলা সাহিত্যে সবচেয়ে জনপ্রিয় চরিত্রে এই অপুর মাধ্যমে খুঁজে পাওয়া যায় নিজের শৈশব আর কৈশোরের যাবতীয় বাস্তবিক স্বাদ এবং মধ্য দিয়ে যেমন গ্রাম্য কিশোরের স্মৃতির জাবর কাটা যায়, তেমনি দুর্গাকে দিয়ে গ্রাম্য বাংলার বাস্তব হিসেবে ফুটে ওঠে। এই দুটি চরিত্র দিয়ে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় আজীবন বাংলা সাহিত্যে বেঁচে তিনি ছিলেন গ্রামীণ পটভূমির সার্থক শিল্পী এবং পথের পাঁচালী উপন্যাসের মাধ্যমে যে চরিত্রটি তা আমাদের গল্প শুনিয়ে, বুঝিয়ে দিয়ে দেখিয়ে দেয়, কত মমতার জড়ানো আমাদের জীবন।

সমগ্র উপন্যাসটি তিনটি খন্ড এবং মোট ৩৫টি পরিচ্ছেদে বিভক্ত। ইন্দির ঠাকরুন এর বর্ণ হয়েছে, অপু দুর্গার একসাথে বেড়ে ওঠা, চঞ্চল শৈশব, দুর্গার মৃত্যু, সপরিবারে কাশি যাত্রা, অপু

বিন, হরিহরের মৃত্যু এবং পরিশেষে নিশ্চিন্তপুর ফিরে আসার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। হরিহর খুব ভালো ষ্কণ, তিনি নিশ্চিন্তপুর গ্রামে থাকেন। ইন্দির ঠাকরুন একজন বৃদ্ধা বিধবা মহিলা, যার দেখাশোনা করার র্ড ছিল না। তিনি হরিহরের বাড়িতে আশ্রয় নেয় এবং হরিহর যে তাঁর দূর সম্পর্কের আত্মীয়। কিন্তু রিহরের স্ত্রী সর্বজয়া একজন খারাপ মেজাজের মহিলা, তিনি বৃদ্ধাকে দেখতে পারেন না। তাই বৃদ্ধাকে সবাসের জন্য একটি কুঁড়েঘর দেওয়া হয়, তবে সর্বজয়া এর ৬ বছরের মেয়ে দুর্গা ইন্দির ঠাকরুনকে খুব লোবাসে এবং রূপকথা শোনার জন্য ঘন্টার পর ঘন্টা তার সাথে বসে থাকে। কিছুদিন পর সর্বজয়ার কটি পুত্র হয়। সর্বজয়া ইন্দির ঠাকরুনকে হিংসা করতে থাকে। কারণ তিনি মনে করেন যে দুর্গা তার মায়ের য়ে বৃদ্ধাকে বেশি ভালোবাসে। তাই ইন্দির ঠাকরুনকে সামান্য কারণে নির্মম ভাবে কুড়ে ঘর থেকে বের র দেওয়া হয়। অসহায় বৃদ্ধা তার মৃত্যুর মুহূর্তে আশ্রয়ের জন্য অনুরোধ করেন কিন্তু সর্বজয়া হৃদয়হীন বে না করেন এবং বৃদ্ধা চালের গুদামে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে মাজের নির্মমতার এবং নিষ্ঠুরতার প্রতিফলন ঘটিয়েছেন। চার বছর পর ছেলে অপু প্রকৃতির সৌন্দর্য এবং র্যের প্রতি অত্যন্ত কৌতূহল এবং সংবেদনশীল হতে থাকে। সে এবং তার বোন দুর্গা সর্বদা নতুন কিছু সাহসীক কাজের জন্য বাইরে বের হতে থাকে, যেমন জঙ্গলে ঘুরে বেড়ানো, আদিবাসী খেলায় অংশগ্রহণ বং গোপনে ফুল ও ফল পাড়া। অপু গ্রামের পাঠশালায় ভর্তি হয়, সেখানে গ্রামের অনেক প্রবীণ জড়ো য় বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলে সময় কাটাতো। অপুকে একদিন তার বাবা এক মক্কেলের বাড়িতে নিয়ে যায়। পু এই প্রথম বাইরের জগতের ঝলক দেখতে পায়, যা তার মনকে আনন্দ এবং উত্তেজনায় ভরিয়ে তোলো। গ্রাম্য উৎসব, মেলা এবং যাত্রা ইত্যাদি গ্রাম্য জীবনের একঘেঁয়েমি প্রবাহে বৈচিত্র এবং আনন্দ য় আসে। দুর্গা অস্থির কিন্তু অতি নির্দোষ এক মেয়ে হঠাৎ করে মারা যায়, যা পুরো পরিবারকে শোকে বিয়ে দেয় এবং তার ছোট ভাইকে একা করে দেয়। সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এখানে গ্রামীণ রিবারের মর্মান্তিক দৃশ্য বর্ণনা করেছেন। হরিহর দীর্ঘসময়ের জন্য বাড়ি ছেড়ে চলে যায় এবং জীবিকা র্জনের জন্য মরিয়া হয়ে সংগ্রাম করতে থাকে। বাড়ি ফেরার পর হরিহর নিশ্চিন্তপুর ছেড়ে চলে যাওয়ার দ্ধান্ত নেয়। তারা সব গোছগাছ করে রেলওয়ে স্টেশনে যায় এবং চিরকালের মতো তাদের দুঃখের স্মৃতি খে যায়।

কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রায় সব গদ্য আখ্যানের মূল বক্তব্য সবুজ প্রকৃতি। র্মানে পরিবেশ ভাবনা এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে বিভূতিভূষণের পথের পাঁচালী একটি যুগোপযোগী ত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ উপন্যাস। মানুষ এবং সমাজ পরিবেশের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পর্ক স্থাপন করে এবং

নিজেদের অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখতে সক্ষম হয়। এই উপন্যাসের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যা
আমাদেরকে পরিবেশ সচেতনতার পাঠ প্রদান করেছেন। গ্রামীণ সমাজ চিত্র বর্ণনা করার সঙ্গে সঙ্গে
সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন বাস্তু তন্ত্রের চিত্র, ব্যাখ্যা করেছেন জীববৈচিত্র এবং প্রকৃতির আরো
উপাদানগুলোকে। তাঁর এই প্রথম উপন্যাস পথের পাঁচালী প্রাকৃতিক পরিবেশ, মানব এবং সমা
অন্তঃসংযোগের গভীরতম স্তরের সাথে সম্পর্কিত। তাঁর পথের পাঁচালীর পথ বিশ্বজোড়া। সেই পথেই
কোটি হরিহর, সর্বজয়া, ইন্দিরা ঠাকরুন, অপু-দুর্গাদের অবস্থান, চলাফেরা এবং অবাক বিস্ফোরি
সেই পথের সৌন্দর্যে আমরা এখনও মুগ্ধ। প্রকৃতি পরিবেশকে বাদ দিয়ে মানুষ যে অসম্পূর্ণ, মনু
প্রকৃতির অঙ্গ এবং তাঁর শিল্প ভাবনার কেন্দ্রে অবস্থান করছে, তা তিনি তাঁর পথের পাঁচালী উপ
সুন্দরভাবে উপস্থাপন করেছেন। গ্রামীণ ভূদৃশ্য, মানব প্রকৃতি বন্ধন, করুন বিভ্রান্তি, সমাজের দুর্বল অ
সাথে খারাপ আচরণ, প্রকৃতির উপর সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতি এই উপন্যাসের সর্বাধিক গুরুত্বপূ
উপন্যাসে একটি ট্রেনের উপস্থিতি নতুন এবং পুরনো, শহুরে ও গ্রামীণ প্রকৃতি পরিবেশ এবং
সংযোজনের একটি ইঙ্গিত বহন করে। রবীন্দ্র যুগে গল্প-উপন্যাসে গ্রাম বাংলার সমাজ চিত্র এবং
পরিবেশ চিত্রকে জীবন্ত করে তুলেছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই পথের পাঁচালী উপ
মাধ্যমে। গ্রাম বাংলার সহজ সরল জীবন চিত্র এবং প্রকৃতি ও প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর অন্যতম প্র
উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতি পরিবেশ বর্ণনায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় উল্লেখ করেছেন "সেই ছেলে
প্রথম কুঠির মাঠে আশার দিনটি হইতে এই মাঠ-বন-নদীর কি মোহ যে তাকে পাইয়া বসিয়াছে
ফেলিয়া ছাতিম গাছের ছায়ায় বসিয়া চারিদিকে চাইতেই তাহার মন অপূর্ব পুলকে ভরিয়া ওঠে। মা
বা না হোক যখনই ঘন বৈকালের ছায়া ওঠে, স্নিগ্ধ বাতাসে চারিধার হইতে বউ কথা কও, পাখির
ভাসিয়া আসে, ডালে ডালে অভ্র আবির ছড়াইয়া সূর্যদেব সোনাডাঙ্গার মাঠে সেই ঠ্যাঙ্গারে বট
আড়ালে হেলিয়া পড়েন, নদীর জল কালো হইয়া যায়, গাঙশালিখের দল কলরব করিতে করিতে
ফেরে, তখনই তাহার মন বিভোর হইয়া ওঠে।" গ্রামের প্রকৃতি-পরিবেশ এর পটচিত্র অঙ্কন করে
প্রকৃতি-পরিবেশকে আত্মার সঙ্গে তুলনা করেছেন এবং প্রকৃতি ও পরিবেশের প্রতি তাঁর অনুরাগ, ভা
প্রকাশিত হয়েছে এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে। প্রকৃতির বিভিন্ন উপাদানের সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের যে
সম্পর্ক বিরাজমান সেই কথাই পাঁচালী উপন্যাসে কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় সু
উপস্থাপন করেছেন এবং এর মাধ্যমে মূলত তাঁর হাত ধরেই বাংলা সাহিত্যের সাম্রাজ্যে সাহিত্য
পরিবেশের মধ্যে একটি সম্পর্ক স্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে গোটা পৃথিবীতে পরিবেশ এবং সাহিত্য

একটি নতুন ধরনের সমালোচনা এবং তত্ত্বের উৎপত্তি সাহিত্য প্রেমীদের কাছে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। তাই বলা যায় পথের পাঁচালী উপন্যাসটি সাহিত্যের সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্কের সমালোচনার ক্ষেত্রে বিশেষ উপাদান হিসেবে কাজ করে।

কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতি এবং পরিবেশের প্রতি ভালোবাসা এবং অনুরাগ পথের পাঁচালী উপন্যাসের মধ্যে ছত্রে ছত্রে বর্ণনা করেছেন। "সে কাহাকেও বুঝাইয়া বলিতে পারে না সে কি ভালোবাসা, এই মাটির তাজা রোদ পোড়া গন্ধটা, এই ছায়া ভরা দূর্বাঘাস, সূর্যের আলো মাখা পথ, গাছপালা, পাখি, বন, ঝোপ, ফুল, ফল, আলকুশি, বনকলমি, নীল অপরাজিতা।" এই উপন্যাসের অন্যতম প্রধান চরিত্র অপু এবং অপুর শৈশব কেটেছিল গ্রামের প্রকৃতির ঘনিষ্ঠ সংস্পর্শে। পরিবর্তন এবং ঋতু পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে ইছামতির নব নব পরিবর্তনশীল রূপ সম্বন্ধে তাঁর চেতনা স্পষ্ট ছিল এবং এর ফলে গাছপালাতে, জলে-স্থলে, শূন্যে, ফুলে, ফলে কি পরিবর্তন হয় তা সে লব্ধি করতে পারতেন। প্রকৃতি এবং পরিবেশের ধারনা সাহিত্যকর্মে পথের পাঁচালীর মাধ্যমে প্রতিফলিত ছে। সামাজিক প্রাণী হওয়ায় প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সম্প্রতি আমরা পরিবেশগত ন্যা অনুভব করছি। দেখানোর চেষ্টা করা হয়েছে যে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পথের পাঁচালী উপন্যাস তিক পরিবেশ, মানব এবং সমাজ আন্তঃসংযোগের গভীরতম স্তরের সাথে সম্পর্কিত। প্রকৃতি অথবা বেশ শব্দটি আমাদের চারপাশের বহিরাগত পরিবেশকে বোঝায় যা পৃথিবীর জীবিত এবং জড় উভয় ক অন্তর্ভুক্ত করায়। প্রাণী তথা মানুষ, সমাজ, পরিবেশের অবিচ্ছেদ্য অংশ এবং এদের মধ্যে জটিল ও আদিম সম্পর্ক বিরাজমান। সেই কারণেই কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় এর কাছে প্রাকৃতিক বেশ, মানুষ এবং সমাজ তাঁর সাহিত্য কর্মে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এই দৃশ্যমান বিশ্বপ্রকৃতি, এবং সমাজ হলো তাঁর সাহিত্যের পরম সম্পদ। তাই তিনি শৈশব থেকে দুচোখ ভরে এই বিশ্বরূপের াঘরে অপরূপ সব দৃশ্যকে নিত্য প্রত্যক্ষ করে গিয়েছিলেন। এবং এরই সঙ্গে মানুষের প্রতিদিনের সুখ-হাসি-কান্না এবং আনন্দ, বিরহে তাঁর জীবনযাপন প্রবাহিত হয়েছে। তাঁর সৃষ্টির মায়াজালে অরণ্য তি এবং জীব-অনুরাগ যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে গিয়েছে।

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর এই উপন্যাসের মাধ্যমে গ্রামীণ সমাজ জীবনের প্রেক্ষাপট বর্ণনা ছেন। ব্রিটিশরা ভারতবর্ষে আসার পূর্বে বাংলার সমাজ ব্যবস্থা তাঁর এই উপন্যাসে উঠে এসেছে। অপুর মের চৌহদ্দির বাইরে এযাবৎকাল পর্যন্ত বাহির হয় নাই। অর্থাৎ গ্রামীণ ব্যবস্থায় তখন পর্যন্ত শহুরে লাগেনি। এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি গ্রামীণ বাংলার সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক অবস্থার চিত্র

প্রকাশ করেছেন। তিনি যে অঞ্চলের প্রেক্ষাপটে পথের পাঁচালী রচনা করেছেন, অঞ্চলটি বর্তমানে উ
পরগনা জেলার গোপালনগর থানার অন্তর্গত। তাঁর বর্ণনায় মাধব পুরের মাঠ, ইছামতি নদী, বাঁও
মধ্যানন্দপুর প্রভৃতি স্থানের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য এখনও বর্তমান। আমার নিজের প্রয়োজনে আমি এই
গুলি পরিভ্রমণ করেছি। "মাঠের ঝোপগুলো, উলুখড়, বনকলমি ও কুলগাছে ভরা, তেঁ
আরঝোপগুলোর মাথা বড় বড় সবুজপাতা বিছাইয়া ঢাকিয়া দিয়েছে।" বিংশ শতাব্দীর কুড়ির
নিশ্চিন্দপুর নামক বাংলার এক প্রত্যন্ত অঞ্চলের অপু ও তার পরিবারের জীবনযাত্রা এবং এবং
সৌন্দর্যের প্রেক্ষাপট রচনা করেছেন। কথা সাহিত্যিক বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকৃতির বাস্তুতন্ত্রে
জীববৈচিত্র্যের অবস্থা ও তার ধারাবাহিক পরিবর্তন উপলব্ধি করে পথের পাঁচালী উপন্যাসকে সৃষ্টি করে
পরিবেশ সম্পর্কে গভীর সচেতনতার কথা তিনি আমাদেরকে এই উপন্যাসের মাধ্যমে সজাগ করেছেন।
কাহিনীকে এবং প্রকৃতির দৃশ্যপটে অসাধারণ শিল্প কুশলতায় পাঠককে মুগ্ধ করেছেন। বিভূ
বন্দ্যোপাধ্যায় পাঠককে কাহিনী বলেননি, তিনি কাহিনী দেখিয়েছেন। অর্থাৎ তাঁর রচনার বর্ণনা ভঙ্গি
এতটাই মুগ্ধ করে যে, পাঠক মনের আয়না সেই বর্ণনার প্রতিচ্ছবি দেখতে পায়। পথের পাঁচালী লে
প্রথম এবং শ্রেষ্ঠ উপন্যাস বলে আমার বিশ্বাস, এই উপন্যাসের মধ্য দিয়ে তিনি বাংলা সাহিত্যে
জনপ্রিয় ঔপন্যাসিক এর মর্যাদা লাভ করেন। এই পথের পাঁচালী উপন্যাসটির মধ্য দিয়ে হাজার
গ্রাম্য কিশোর অপুর প্রকৃতিপ্রেম এবং আমার গ্রাম্য জীবনে সবাই সবার সঙ্গে মিলেমিশে আছি
বর্ণনা করেছেন এবং বর্ণনা করেছেন প্রকৃতি এবং পরিবেশ আমাদের একটি অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। কথা সা
বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় গভীর মমতা দিয়ে তিনি তাঁর চরিত্রগুলি এঁকেছেন। অর্থাৎ তিনি চরিত্রের বৈ
যে ব্যাপ্তি দেখিয়েছেন তা বাংলা সাহিত্যে কেন বিশ্বসাহিত্যেও বিরল। পথের পাঁচালীর অপুর
সরল বালক, সেই অপুর শহরের পরিবেশে মিশে যাওয়া যুবক এবং গ্রামের কল্পনা প্রবণ বালক
ধীরে বড় হয়ে পরিবেশের সঙ্গে যেভাবে খাপ খাওয়াতে সক্ষম হয়, তেমন করে বাঙালির গ্রাম্য
জীবন কে ফুটিয়ে তুলতে সক্ষম হয়েছেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়। এবং আমার বিশ্বাস এই
পাঁচালী উপন্যাসটি বর্তমান সময়ে পরিবেশ সচেতনতা বৃদ্ধি এবং পরিবেশ সংরক্ষণের ক্ষেত্রে
উপযোগী।

"বীরভূম জেলার আদিবাসী সমাজে বিশ্বায়নের প্রভাব"

ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী
সহকারী অধ্যাপক, ইংরেজী বিভাগ

বিজ্ঞান, প্রযুক্তি এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি সাধনের দ্বারা বিশ্বায়ন পৃথিবীর যে কোন প্রত্যন্ত
ন্ত বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের উপর অল্পবিস্তর পরিযায়-বৃত্তি আরোপ করেছে এবং এই আরোপ
ভূমের আদিবাসী সমাজের উপর বেশ সুস্পষ্ট। তবে বিশ্বায়নের সবচেয়ে প্রত্যক্ষ প্রভাব দেখা যায় এই
াজের মূলগত সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে। সারা পৃথিবীতে আদিবাসী সমাজের সাধারণ বিন্যাসের পটভূমি
াবে অরণ্য, পাহাড় ইত্যাদি তথাকথিতমূল সভ্যতা থেকে বিচ্ছিন্ন প্রাকৃতিক পরিবেশকে পাওয়া যায়
ং সাধারণত দেখা যায় যে এইসব অঞ্চলে বা তাদের আশেপাশে নানারকম খনিজ পদার্থের উৎস
ক। এইসব অঞ্চলের সামগ্রিক প্রভাব যেখানে বসবাসকারী আদিবাসী সমাজের উপর পড়ে। ভারতে
বাসকারী আদিবাসীরা বহুবিধ এবং বৈচিত্রময় উপজাতি-গোষ্ঠীতে বিভক্ত এবং তাদের সংখ্যা ২০১১
লর জনগণনা অনুসারে ভারতের মোট জনসংখ্যার ০৮.০৬ শতাংশ। তাদের ভাষা, অর্থনীতি, সমাজ,
কৃতি ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রেই বিবিধ ভিন্নতা দেখা যায়। তবে বিশ্বায়নের প্রভাবে এই ভিন্নতা কিছু কিছু
ত্রে কয়েকগুন বেড়েছে। দারিদ্র, বঞ্চনা, অসাম্য, বসবাসকারী অঞ্চলের অবস্থান ইত্যাদি নিরিখে
ভিন্ন আদিবাসী সমাজের মধ্যে বৈষম্য নিয়ে বিতর্কের অবকাশ প্রায় নেই বললেই চলে। সামাজিক ভাবে
ছিয়ে পড়া এইসব আদিবাসী সমাজের মধ্যে বীরভূমের বিভিন্ন আদিবাসী সমাজের অবস্থান চিহ্নিত
 আমি চেষ্টা করবো তাদের উপর বিশ্বায়নের প্রভাব ব্যাখা করতে। একই সঙ্গে তাদের জীবনযাত্রার
, সামাজিক প্রেক্ষিতে ভালো থাকা বা মন্দ থাকার অভিজ্ঞান নিরূপনের পাশাপাশি গড়ে ব্যাক্তি মানুষের
ারিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক অবস্থিতী নির্দেশ করারও চেষ্টা করবো।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ৭.৮১ শতাংশ আদিবাসী
জাতিদের দখলে এবং সময়ের অমোঘ নিয়মে স্বাভাবিক পরিবর্তনের রূপরেখা অনুসারে এই বিবিধ
গোষ্ঠীর সমাহার সুদীর্ঘকাল ধরে বিবর্তিত হয়ে চলেছে তাদের সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক জীবন
াসের ক্ষমতার সঙ্গে তাল রেখে। আদিবাসী সমাজের এই স্বাভাবিক বিবর্তনের রূপরেখাকে যে স্বল্প
 ঘটনা উল্লেখযোগ্য ভাবে প্রভাবিত করেছে বিশ্বায়ন তাদের মধ্যে অন্যতম এবং যেহেতু এটির একটি
াত্রিক প্রেক্ষিত আছে এটি বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই সমস্ত আদিবাসী সমাজের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে
 মূলত এই প্রভাব দেখা যায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এবং এর

প্রভাবে সর্বাধিক পরিবর্তিত হয় জীবনযাত্রার মান। এক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান বলতে আমি ব্যক্তি
সমাজ উভয়ের একত্রে অথবা পৃথকভাবে ভালো থাকার চেষ্টা করার প্রবণতাকে নির্দেশ করছি কা
প্রবণতাকে চিহ্নিত করা তুলনামূলকভাবে সহজ। এই প্রবণতার মধ্যে উল্লেখযোগ্য ভাবে উপস্থি
সম্পদ আহরণ এবং সংরক্ষণের প্রচেষ্ট, আয়ের সঙ্গে সঙ্গতি আছে এমন কর্মের সঙ্গে নিজেকে
চেষ্টা, শারীরিক তথা স্বাস্থ্য এবং পরিচ্ছন্নতার নিরিখে নিজেকে উচ্চতর অবস্থানে নিয়ে যাবার চেষ্টা,
আর্থসামাজিক প্রেক্ষিতের বিস্তার ঘটানোর চেষ্টা এবং নিজের সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলকে পরিমার্জনের
এগুলি মাপকাঠিতে বীরভূমের আদিবাসী সমাজ তার পূর্বতন স্বাভাবিক বিবর্তনের পথ থেকে কতট
এসেছে মূলত এটাই আমার উপজীব্য।

এইসব আদিবাসী জনগোষ্ঠী ভারতীয় সংবিধানের ৩৬৬ (২৫) নং ধারা অনুসারে 'সি
ট্রাইব' হিসেবে চিহ্নিত এবং ৩৪২ নং ধারায় তাদের বৈশিষ্ট্য এবং অধিকার সুনির্দিষ্ট ভাবে ঘোষণ
হয়েছে। প্রাথমিকভাবে বলা হয়েছে যে এরা প্রান্তিক এবং ভৌগলিক ভাবে আংশিক বা সম্পূর্ণ
অবস্থানে বসবাস করে। জীবন এবং জীবিকা উভয়ক্ষেত্রেই এদের মধ্যে পিছিয়ে পড়ার প্রবণত
যায়। এদের কৃষিকাজের ধরনও অত্যন্ত অনুন্নত। তাই এরা মূলত অর্থনৈতিক ভাবে পিছিয়ে পড়া,
ব্যবহারে অপটু, দরিদ্র, স্বাস্থ্য সূচকে সাধারণভাবে চলনসই মাত্রারও নীচে অবস্থানকারী, সা
পরিমন্ডলের স্বকীয়তা রক্ষার ক্ষেত্রে অত্যাধিক গুরুত্ব আরোপকারী, নিম্নতর স্বাক্ষরতার হার বহ
ভাষা এবং ধর্মাচারণের ক্ষেত্রে সমাজের মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্নত বজায় রাখতে আগ্রহী, অ
জনগোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন এবং রক্ষার অনাগ্রহী জনগোষ্ঠীর সমাহার। ভি.কে.রাও তাঁর
সালে প্রকাশিত 'ইমপ্যাক্ট অফ গ্লোবালাইজেশন অন ট্রাইবাল ইকোনমি' গ্রন্থে এই আদিবাসী জনগ
চিহ্নিত করার মাপকাঠিগুলি এবং তাদের ব্যক্তিগত ও সামাজিক পরিসরে অর্থনীতি সংক্রান্ত প্রবণ
বিশ্লেষণ করার পদ্ধতিগুলি অত্যন্ত সুনিপুন ভাবে উপস্থাপন করেছেন। সমাজের মূল স্রোতে
যোগাযোগের অভাবে এদের সঠিক উন্নয়নের হার অত্যন্ত শ্লথ। এদের সামাজিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের
অত্যন্ত নিম্ন। তাই এরা বহুযুগ ধরে সমাজের মূল স্রোতের দ্বারা শোষিত এবং আংশিক ভাবে নি
বীরভূমের আদিবাসী সমাজের ক্ষেত্রে এই শোষণের দায় বর্তায় মূলত বর্ণহিন্দু সমাজের উপর
ভারতীয় সংবিধান এবং স্বাধীনতা পরবর্তী প্রথম কয়েক দশকের ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত অ
সমাজগুলোকে তাদের নিজস্ব ধাঁচ বজায় রেখে সভ্যতার মূল স্রোতের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে উ
করেছিল। এক্ষেত্রে পন্ডিত নেহেরুর অবদান স্বীকার করতেই হয়। এই পর্বের আদিবাসী সমাজের

ং তার প্রচেষ্টার চিত্র বিস্তারিত ভাবে রয়েছে চান্ডিয়া এবং মিশ্রর ২০০৯ সালে প্রকাশিত "ইমপ্যাক্ট অফ
বালাইজেশন অন ট্রাইবাল গ্রুপ অফ ইন্ডিয়া" গ্রন্থে। তবে এই চিত্র যে সার্বিকভাবে ভারতীয় আদিবাসী
জকে প্রভাবিত করতে পারেনি তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বীরভূমের আদিবাসী জনগোষ্ঠী মূলত এই
ত অংশের মধ্যে পড়ে। সমাজের বিভিন্ন স্তরে এরা বঞ্চনার শিকার হতে থাকে এবং তাদের জাগতিক
কৃতির উন্নতি ও বিবর্তন অনেকাংশেই সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে। আজও এই সমাজের দ্বৈত সত্তার
াপোড়েনের মধ্যে থেকেই পূর্বতন সামাজিক বিন্যাসের নিরিখে এক নতুন ও বিশ্বায়িত সামাজিক
্যাসের ক্ষেত্র রচনার চেষ্টা করে চলেছে। এর মধ্যে মিশে রয়েছে আধুনিকতা, বাজার অর্থনীতির
দন্ডে নিজস্ব সংস্কৃতিকে পণ্যায়িত করা বা না করার প্রবণতা, রাজনৈতিক ক্ষমতায়ন ও সেই ক্ষমতা
ং সরকারের বিভিন্ন সমাজকল্যাণমূলক প্রকল্পের সুবিধা নিয়ে ব্যক্তিগত এবং সামাজিক উন্নয়নের চেষ্টা।
শতকের শেষ দশক থেকে সরকারি প্রচেষ্টার পাশাপাশি এদের উপর এসে পড়ে বিভিন্ন বেসরকারি
জকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান আর এদের হাত ধরেই দ্রুত হয় বিশ্বায়নের প্রভাব।

বিশ্বায়ন শব্দটির প্রথম ব্যবহার আমরা পাই বিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে। ষষ্ঠ দশকে এই
ার বিস্তার হয়ে বেশ চোখে পড়ার মত কিন্তু শেষ দশকে এই ধারণার যে বহুমাত্রিক প্রেক্ষিত উন্মোচিত
তা এর আগে দেখা যায়নি। এই উন্মোচনের প্রাথমিক কারণ প্রযুক্তিগত উন্নতি তবে এই সময়ের
জিক, সাংস্কৃতিক এবং অর্থনৈতিক বিবর্তনের গুরুত্বও অপরিসীম। M. Aerlthayi এর "ইমপ্যাক্ট
গ্লোবালাইজেশন অন ট্রাইবালস" (২০০৯) গ্রন্থে আদিবাসী সমাজের উপর এই পর্বের বিশ্বায়নের
ব সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা রয়েছে। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবে সমাজের মূল স্রোতের সাংস্কৃতিক
বন্ধনের প্রচেষ্টা এবং তার ফলে আদিবাসী সমাজের আরো বেশি করে সমাজের মূল স্রোতের প্রতি
হাকে এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে ব্যাখা করা হয়েছে। বিশ্বজনীন পরিবারের ধারণা থেকে আদিবাসী
জ প্রাথমিকভাবে নিজেকে পৃথক রাখাই শ্রেয় মনে করে তবে জাতীয় অর্থনীতি যেভাবে ধীরে ধীরে
র্জাতিক অর্থনীতির দ্বারা প্রভাবিত হতে শুরু করে যে বিংশ শতকের শেষ দশকে এসে আদিবাসী
জ আর বিশ্বায়িত বাজার, বিদেশী পুঁজি বিনিয়োগ, বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি, বিশ্বায়িত পরিযায়বৃত্তি,
য়িত সাংস্কৃতিক প্রক্ষেপ ইত্যাদির প্রভাবের বৃত্তের বাইরে নিজেকে সরিয়ে রাখতে ব্যর্থ হয় এবং
মিকভাবে মনে করে যে বিশ্বায়নের প্রভাবেই তারা দারিদ্র, অসাম্য, সমাজের মূলস্রোতের সঙ্গে অপটু
াযোগ, অনিয়ন্ত্রিত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, অপর্যাপ্ত স্বাস্থ্য এবং শিক্ষা পরিকাঠামো ইত্যাদির হাত থেকে রক্ষা
য় এক বিশ্বায়িত গ্রামের অধিবাসী হিসেবে সার্বিক জাগতিক অধিকার লাভ করবে। একইসঙ্গে এই

আদিবাসী সমাজ স্বপ্ন দেখতে শুরু করে উন্নত প্রযুক্তি ব্যবহারের, উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থার
পাওয়ার, অর্থনৈতিক উন্নয়নের নতুন নতুন পথ খুলে যাওয়ার এবং সমাজের মূল স্রোতে আংশিক
মিশে গিয়েও সমান্তরাল সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিমন্ডল বজায় রাখার। মূলত যে তিন
জীবিকা এই সমাজের অস্তিত্বের মূল ভিত্তি হয়ে উঠেছিল সেই কল-কারখানা নির্ভর কাজ, জমি-নির্ভ
এবং অরণ্য-নির্ভর কাজ বিশ্বায়নের প্রভাবে মূলগত ভাবে একে অপরের সাথে মিশে যায়।

২০১১ সালের জনগণনা অনুসারে ভারতে মোট আদিবাসী জনসংখ্যা হল ২১৪৬৭১৭
পশ্চিমবঙ্গের ক্ষেত্রে এই সংখ্যা হল ৯১৩৪৭৭৩৬। পশ্চিমবঙ্গে মোট আদিবাসী জনগোষ্ঠীর সংখ্যা
এবং এদের আংশিক শিক্ষিত, অশিক্ষিত, নোমাডিক এবং যাযাবর মূলত এই চারভাগে ভাগ ক
এদের উপার্জনের উৎসকেও মূলত চারভাগে ভাগ করা যায়। যদিও উভয় ক্ষেত্রেই একভাগকে অন্য
উপর সমাপতিত হতে দেখা যায়। অরণ্য নির্ভর জীবিকার প্রভাব বীরভূমের আদিবাসী জনসমাজে
খুব একটা উল্লেখযোগ্য নয়। এই সমাজে নিজস্ব জমির পরিমাণও নগণ্য তাই মূলত এরা অন্যের
কাজ করা শ্রমিক হিসেবে অথবা ছোটখাটো কারখানায় অদক্ষ শ্রমিক হিসেবে এদের জীবিকা অর্জ
একই সঙ্গে সমাজের মূল স্রোতের এবং অর্থনৈতিকভাবে অপেক্ষাকৃত উন্ন পরিবারের কর্মসহায়ক হি
এদের জীবিকা অর্জন করতে দেখা যায়। এই চার ধরনের উপার্জনের উৎস ছাড়াও দেখা যায় যে বী
আদিবাসী জনসমাজ মোটেও একমাত্রিক নয় এর বিস্তার এবং বিভাজন অনেকক্ষেত্রেই সমাজে
কাঠামোর বিন্যাসকে মনে পড়িয়ে দেয়। সাঁওতাল, মুন্ডা, হো এবং ওরাঁও মূলত এই চার ধরনের জ
আমরা বীরভূমে দেখতে পাই। প্রাথমিকভাবে এরা সকলেই যাযাবর এবং অরণ্যজীবি। এদে
বাসস্থান ছোটনাগপুর মালভূমি এবং তার সংলগ্ন অরণ্য। ঔপনিবেশিকতাবাদের প্রভাবেই এরা প্রথ
হয় তাদের আদি বাসস্থান আর আদি জীবিকা ত্যাগ করতে। এরা মূলত হয়ে ওঠে কৃষি এবং শি
ক্ষেত্রেরই অদক্ষ শ্রমিক। তারা সমাজের মূল স্রোতের থেকে ভৌগলিক ভাবে বিচ্ছিন্ন না থাকলেও সা
সাংস্কৃতি, অর্থনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি ক্ষেত্রে স্বকীয়তা বজায় রাখে। তবে জীবিকার কারণে তাদের
রাখতে হয় মূলত বর্ণহিন্দু সমাজের সঙ্গে কারণ জমি ও পুঁজি উভয়ের উপর তাদের দখলই ছিল
আদিবাসী সমাজের এই যোগাযোগ ছিল এতই ক্ষীণ যে স্বাধীনতার পর প্রথম তিন দশকে
এইসব জনগোষ্ঠীর উন্নয়নের হারে উল্লেখযোগ্য কোন পার্থক্য নজরে আসে না। শিল্পায়ন এবং
হারও বীরভূমে খুব একটা উল্লেখযোগ্য ছিল না। আধুনিক, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, জীবিকা ইত্যাদি
উন্নয়নের হার ছিল নগণ্য। বিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে প্রথম এইসব জনগোষ্ঠীর উপর

র্থসামাজিক উন্নয়নের প্রভাব চোখে পড়ে। শিক্ষার প্রসার এবং সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা এই
য়নের পথকে সুগম করে। সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ফলে সমাজের মূল স্রোত থেকে
নাবিধ ধারণা, পণ্য, রীতি, বিশ্বাস, মূল্যবোধ, প্রযুক্তি ইত্যাদি প্রবেশ করতে থাকে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির
ধ্যে এবং তারা তাদের আদি সাংস্কৃতিক পরিমন্ডলের উত্তরোত্তর সংস্কার ঘটাতে থাকে। এডওয়ার্ড বি.
ইলর তাঁর "প্রিমিটিভ কালচার" (১৮৭১) গ্রন্থে সুনিপুন ভাবে জ্ঞান, বিশ্বাস, শিল্প, আইন, মূল্যবোধ,
থা, অভ্যাস ইত্যাদির নিরিখে আদি সংস্কৃতি এবং তার বিবর্তনের প্রক্রিয়া বর্ণনা করেছেন। বীরভূমের
াদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির উপর সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করে সরকার প্রদত্ত পাঠ্য বই, বই কেনার টাকা,
াক মাধ্যমিক এবং উচ্চমাধ্যমিক স্তরের স্কলারশিপ, মেধানির্ভর স্কলারশিপ, স্নাতক ও স্নাতকোত্তর স্তরের
লারশিপ, বৃত্তিমূলক শিক্ষা সংক্রান্ত স্কলারশিপ এবং বর্তমানে কন্যশ্রী প্রকল্প। এই প্রকল্পগুলি প্রভাবে
াক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়েছে, জীবন-জীবিকা সংক্রান্ত ধারণার আমূল পরিবর্তন ঘটেছে এবং সর্বোপরি
য়েদের বাল্যবিবাহ, অপরিণত শরীরে গর্ভধারণ, শিশু ও প্রসূতির মৃত্যু ইত্যাদি বিবিধি ক্ষেত্রে বৈপ্লবিক
রিবর্তন ঘটেছে এবং এই পরিবর্তনের হাত ধরে এই সমাজে প্রবেশ করছে বিশ্বায়ন।

আদিবাসী সমাজের অর্থনৈতিক উন্নতিতে সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে ভারত
রকারের "মিনিস্ট্রি অফ সোশাল জাস্টিস অ্যান্ড এমপাওয়ারমেন্ট" আর "মিনিস্ট্রি অফ ট্রাইবাল
য়েলফেয়ার"। এই দুই বিভাগের যেসব প্রকল্পগুলো সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ সেগুলো হল ঃ

) রোজগার বৃদ্ধি যোজনাঃ এই যোজনার মধ্যে কৃষিকাজ, বাগান করা, জলসেচ, পশুপালন, অরণ্যজাত
ব্যের সংরক্ষণ ইত্যাদি গুরুত্বপূর্ণ।

) বৃত্তিমুখী প্রকল্প ঃ এই প্রকল্পের মাধ্যমে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন, ফ্যাশন নির্ভর জীবিকায় দক্ষতা অর্জন,
ভিন্ন যন্ত্রচালনা ও মেরামতি, কম্পিউটার প্রশিক্ষণ ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

এই সমস্ত প্রকল্পে মাধ্যমে আদিবাসী যুবক যুবতীরা আধুনিক প্রযুক্তি এবং অর্থনীতির সঙ্গে পরিচিত
ওয়ার সুযোগ পায় আর তারা তাদের প্রাথমিক জীবিকা থেকে সরে এসে নতুন নতুন জীবিকা খুঁজে নিতে
াকে। পড়াশোনা এবং চাকরির ক্ষেত্রে সংরক্ষণ তাদের সামনে নতুন রাস্তা খুলে দেয় আর আদিবাসী
মাজের উপর প্রশাসনিক সুযোগ সুবিধা সুনিশ্চিত করে সরকার তাদের সমাজে এবং অভূতপূর্ব স্থিতাবস্থা
জায় রাখার ব্যবস্থা করে। বীরভূমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীর প্রায় ৪০ শতাংশ মানুষ হয় বিভিন্ন সরকারি
থবা বেসরকারী সংস্থায় কর্মরত অথবা তারা স্বাধীন ভাবে কর্মরত। শিল্পায়নের প্রভাবে একদিকে তারা
াদের জমি ও জঙ্গল হারাতে থাকে এবং অন্যদিকে তারা বিকল্প জীবিকা খুঁজে নেয়। ২০১১ সালের

জনগণনা অনুসারে সরকারি রোজগার বৃদ্ধি যোজনার ফলে সুবিধা প্রাপ্ত হয় বীরভূমের প্রায় ৬৮.১
আদিবাসী মানুষ, যা ২০০৮-২০০৯ সালের তুলনায় ২৫.১১ শতাংশ বেশী।

বর্তমানে বিশ্বায়ন কোন নতুন ধারণা না হলেও এর প্রভাবে স্থান ও কালের সীমারেখা এ
মুছে যেতে শুরু করেছে যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের উপরই পড়তে শুরু করেছে এর প্রভাব
কালের সীমারেখা এমন ভাবে মুছে যেতে শুরু করেছে যে বিশ্বের প্রায় প্রতিটি দেশের উপরই প
করেছে এর প্রভাব। এক্ষেত্রে বিশ্বায়নের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয় রয়েছে আধুনিকতা, শিক্ষা
নগরায়ন আর এর প্রভাবেই বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ব্যবহারের প্রবণতার হার উল্লেখযোগ্য ভাবে বেড়ে
সবথেকে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, পরিবহন, ইন্টারনেট এ
সোশ্যাল মিডিয়া। এগুলির প্রভাব বীরভূমের বিভিন্ন প্রত্যন্ত অঞ্চলে বসবাসকারী আদিবাসী জ
উপরও সুস্পষ্ট। সাধারণভাবে মনে করা হয় যে বিশ্বায়নের প্রভাবে যে কোন জনগোষ্ঠীর সুখ
নির্ণায়ক সূচক উর্দ্ধগামী হয়, সামাজিক এবং ব্যক্তিগত সমৃদ্ধি আসে, অশিক্ষা, দারিদ্র্য, অসাম্য ই
হয়ে সেই জনগোষ্ঠীর এক বিশ্বায়িত মানব সমাজের অঙ্গীভূত হয় কিন্তু বাস্তব চিত্র অনেকক্ষে
বিপরীত কথা বলে। বিশ্বায়ন কোনও ভাবেই ব্যক্তিগত তথা সামাজিক প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তির অসম
সম্পূর্ণরূপে নিয়ন্ত্রন করতে পারেনি। অনেকক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রান্তিক
জনগোষ্ঠী আরো প্রান্তিক বা অবদমিত অবস্থান লাভ করেছে। তবে এই প্রবণতার ব্যতিক্রমও
বীরভূমের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির উপর বিশ্বায়ন এক মিশ্র প্রভাব ফেলেছে। ব্যক্তিবিশেষ বা
সক্রিয়তার উপর নির্ভর করে ছোট ছোট গোষ্ঠী বিশ্বায়নের প্রভাবকে কাজে লাগিয়ে জীবনযাত্রার মা
ক্ষেত্রে দৃষ্টান্তমূলক অগ্রগতি লাভ করেছে কিন্তু প্রান্তিক অবস্থানে থাকা এইসব জনগোষ্ঠীর এক
বিশ্বায়নের প্রভাব থেকে নিরাপদ দূরত্ব বজায় রাখাই শ্রেয় বলে বিবেচনা করেছে। এক্ষেত্রে
উন্নয়নশীল, ধনী ও দরিদ্র, সম্পদ প্রাপ্ত ও অপ্রাপ্ত ব্যক্তি ও গোষ্ঠীর মধ্যে অসাম্য বেড়েছে বই কমে
ভারতবর্ষেই বিশ্বায়ন এইভাবে মিশ্র প্রভাব ফেলেছে এবং বীরভূমের ক্ষেত্রে এর কোন ব্যতিক্র
পড়েনা। গ্রামগুলি মধ্যে সড়ক যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গ জীবনযাত্রার মানে
একধরনের সাযুজ্য দেখা যায়। তবে বীরভূমের এক প্রান্তের সঙ্গে অন্য প্রান্তের জনগোষ্ঠীর মধ্যে
যথেষ্ট। আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই বৈষম্য বেশ চোখে পড়ার মতো। পুরুষদে
নিরক্ষরতার হার ২০০১ সালে ছিল ৭৪.৯৭ শতাংশ আর সেই হার ২০১১ সালের জনগণনায় নে
৫২.৭২ শতাংশে। এই হার মহিলাদের ক্ষেত্রে ৯০.৪৩ শতাংশ থেকে কমে দাঁড়ায় ৭৫.৭২ শ

ক্ষ এবং মহিলাদের ভিন্ন ধরনের শিক্ষা গ্রহণের প্রবণতাও ৬০.৭ শতাংশ (১৯৬১) থেকে কমে দাঁড়িয়েছে
৫৩ শতাংশে (২০১১)। শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের নিরিখে এই সাফল্যে অন্যতম কারণ হল
য়নের প্রভাব। বর্তমানে প্রাথমিক এবং প্রাক-মাধ্যমিক স্তরের শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য দূরীকরণের
রখে এই সাফল্যের অন্যতম কারণ হল বিশ্বায়নের প্রভাব। বর্তমানে প্রাথমিক এবং প্রাক-মাধ্যমিক
র শিক্ষাক্ষেত্রে লিঙ্গবৈষম্য প্রায় নেই বললেই চলে চিন্ত বিশ্বায়নের প্রভাব যেহেতু এইসব আদিবাসী
গোষ্ঠীর উপর সমানভাবে পড়েনি শিক্ষার আলো থেকে এখনো কিছু কিছু আদিবাসী শিশু বঞ্চিত হচ্ছে
ং মেয়েদের মধ্যে এই বঞ্চনার হার বেশি। অন্যদিকে বিশ্বায়নের হাত ধরে বীরভূমের আদিবাসী
গোষ্ঠীগুলির মধ্যে ঢুকে পড়েছে জীবনযাত্রার মান সংক্রান্ত প্রতিযোগিতা, সংরক্ষণ ব্যবস্থা এবং বিভিন্ন
ারশিপের সুযোগ গ্রহণের প্রবণতা, সামাজিক সুরক্ষা মূলক বিভিন্ন সরকারি প্রকল্প ও উন্নয়নমূলক
ভিন্ন কর্মসূচীর সুযোগ গ্রহণ, বিকল্প জীবিকা নির্বাচনের স্বাধীনতা এবং আরো কিছু ছোটোখাটো
র্বসামাজিক প্রবণতা।

কৃষিজীবি আদিবাসীরা চেষ্টা করছে সরাসরি তাদের কৃষিজ পণ্যকে বিশ্বায়িত বাজারে নিয়ে আসতে।
ক্ষত্রে সরকার এবং বিভিন্ন বেসরকারি সমাজকল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠান তাদের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।
ফলে তাদের জীবনযাত্রার মান বেশ উন্নত হয়েছে এবং সংরক্ষণের সুযোগ সুবিধা পেয়ে বা না পেয়ে
া বিভিন্ন সরকারি বা বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত বা যারা পরিপূর্ণভাবে আত্মনির্ভরশীল তারা তাদের
কার প্রয়োজনেই নিজস্ব জনগোষ্ঠীর বাইরের দুনিয়ার সঙ্গে যোগাযোগ রাখছে এবং সমাজের মূলস্রোতের
ভিন্ন প্রবণতার সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছে। এদের ৬৪.৪(২০১১) শতাংশের কাছে আজ নিজস্ব বাড়ি
ছে এবং মাত্র ৭.৮ শতাংশ বাস করে অন্যের বাড়িতে। গৃহনির্মাণসামগ্রী ব্যবহারের নিরিখেও বেশ
পরিবর্তন চোখে পড়ার মতো। পূর্বের মত অরণ্যজাত সামগ্রীর পরিবর্তে তার ছাদ নির্মাণে অধিক
হার করছে "G.I. Sheet"। এই প্রবণতা ১৯৬১ সালে ছিল ২২.৪ শতাংশ ২০০১ সালে এই
তা দাঁড়ায় ৪১.৭ শতাংশে এবং ২০১১ সালে এই প্রবণতা দেখা যায় ৭০.২৩ শতাংশে। পানীয়
র উৎস হিসেবে কুয়ো ব্যবহারের প্রবণতা ২০০১ সালে ছিল ৪২.৩৮ শতাংশ অথচ সেই প্রবণতা
১ সালে ৮১.০৮ শতাংশে উন্নীত হয়। দৈনন্দিন জীবনে বিদ্যুতের ব্যবহার ২০০১ সালে ছিল ১২.৮০
ংশ কিন্তু এই ব্যবহার ২০১১ সালে ৫১.৭৩ শতাংশে দাঁড়ায়। ২০০১ সালে মাত্র ২৪.৪ শতাংশ
তে শৌচালয়ের সুবিধা ছিল কিন্তু ২০১১ সালে তা বেড়ে দাঁড়ায় ৬১.৩৬ শতাংশে। সাবান, শ্যাম্পু,
ানুনাশক তরল বা ক্রীম ইত্যাদির ব্যবহারও বিগত এক দশকে বেড়েছে উল্লেখযোগ্য হারে। সমাজের

মূল স্রোতের সাথে তাল মিলিয়ে পাল্টে গেছে এদের পোশাক। ফুলের গহনার পরিবর্তে এসে
গহনা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান ও রীতিনীতিতেও এসেছে বিস্তর ফারাক। আদিবাসী সমাজের বিয়ের
এসেছে বহু পরিবর্তন এবং সেই পরিবর্তনের উপর টিভি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির প্রভাব
মত। জীবনযাত্রার মানোন্নয়নের সাথে সাথে পাল্টে গেছে জীবনযাত্রার ধারা। পুরনো পারিবা
ভেঙে গিয়ে গড়ে উঠেছে অনুপরিবার আর এই পরিবারগুলো তাদের আদি বাসভূমি ছেড়ে ক্র
পড়ছে নগরকেন্দ্রিকতার বেড়াজালে গড় বিয়ের বয়স অনেক বেড়েছে। বর্তমানে ১৮ বছরের
বিবাহিত মেয়ে রয়েছে মাত্র ২.৬ শতাংশ আর ২১ বছরের কমবয়সী বিবাহিত পুরুষ রয়েছে
শতাংশ। এই সংখ্যা এক দশক আগেও প্রায় দশগুন বা তার বেশি ছিল। বাইরের সমাজের স
জীবিকা নির্ভর যোগাযোগ বৃদ্ধি পাওয়ার এবং শিক্ষার হার বৃদ্ধি পাওয়ার এদের মধ্যে এক বহুভা
উদ্ভব ঘটেছে যাদের মাধ্যমে বীরভূমের আদিবাসী সংস্কৃতির এক সঙ্করায়িত চেহারা আমাদে
পড়ে। শান্তিনিকেতন কেন্দ্রিক মিশ্র সংস্কৃতির প্রভাবও ঐ অঞ্চলের আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলির উ
প্রকট।

বীরভূম জেলার তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগের বিভিন্ন রিপোর্ট, অধ্যাপক প্রশান্ত ঘোষের ১৯
বিশ্বভারতীয় সোশ্যাল ওয়ার্ক বিভাগে জমা দেওয়া অপ্রকাশিত পি.এইচ.ডি. থিসিস (Demogr
Profile and Changing Occupation Character and Economic Sta
Birbhum District) এবং সি.আর.আই এর ১৯৯১ সালের বুলেটিনে এ.কে. দাসের প্রবন্ধ
Bengal Tribes" এর অনুপ্রেরণায় এবং ১৯৬১ সাল থেকে ২০১১ সাল পর্যন্ত মোট ৬টি জ
রিপোর্টের ভিত্তিতে বিভিন্ন তথ্যের বিশ্লেষণের মাধ্যমে আমি যে ধারণায় উপনীত হতে পারি তা
বীরভূমে আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি বর্তমান বিশ্বের যে কোন পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীর মত বি
তাদের সমস্ত মানবিক সমস্যা সমাধানের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করেছে। তারা মনে করে বি
মাধ্যমেই তারা সামাজের মূলস্রোতে তাদের অংশীদারি পাকা করতে পারবে এবং যাবতীয় বৈষম
প্রান্তিক অবস্থান ইত্যাদি থেকে তাদের মুক্তি ঘটবে। বিশ্বায়নের প্রভাবের সাথে সাথে বিভিন্ন স
বেসরকারী সংস্থার সহযোগিতায় এবং আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থা, প্রযুক্তি ব্যবহারের মাধ্য
তাদের জীবনযাত্রার মানকে অনেকাংশে উন্নত করতে সক্ষম হয়েছে। ভারতবর্ষের জনগণতান্ত্রি
কাঠামো, সংবিধান, সুপ্রিম কোর্টের রায়ে অরণ্যের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত হওয়া ইত্যাদি সাং
আদিবাসী সমাজকে পূর্বতর শোষণ এবং বঞ্চনার হাত থেকে রক্ষা করেছে তবে শিল্পায়ন এবং

ক ধরে তাদের শোষণের মাধ্যমে সমাজের মূল স্রোতের একশ্রেণীর মানুষের কায়েমী স্বার্থ প্রতিষ্ঠিত
য়ছে এবং আদিবাসীদের পরিবার ও সমাজের পূর্বতর সঙ্গবদ্ধ কাঠামো অনেকাংশে নষ্ট হয়ে যাওয়ার
রা তাদের মূলগত আর্থসামাজিক এবং সাংস্কৃতিক চরিত্র ধরে রাখতে সক্ষম হচ্ছে না। এই অবস্থায়
দের প্রকৃত উন্নতি ঘটাতে গেলে প্রয়োজন সরকারের জমি অধিগ্রহণ নীতির পুনর্বিশ্লেষণ, শিক্ষা এবং
স্থ্য পরিকাঠামোর উন্নয়ন এবং উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধি। নাহলে বিশ্বায়নের প্রভাবকে জীবনযাত্রার
নোন্নয়নে পুরোপুরিভাবে কাজে লাগাতে এই আদিবাসী জনগোষ্ঠীগুলি কখনোই সক্ষম হবে না।

পঠন-পাঠনের ব্যস্ততা : হীরালাল ভকত কলেজের লাইব্রেরী।

বাঙালির দর্শনের উদ্ভব ও ক্রমবিকাশ

কৃষ্ণ সাহা

রাজ্য সরকারী অধ্যাপক, দর্শন বিভাগ

মানবভাবনা চিরন্তন দর্শনের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বস্তুত মানব তাত্ত্বিক স সমাধানকল্পেই পৃথিবীর প্রায় প্রতিটি উন্নত দার্শনিক ধারাআবর্তিত ও বিকশিত হতে দেখা যায় ধরনের প্রবণতা বাঙালি জাতির মধ্যে পরিলক্ষিত হয়। এদের মধ্যে হৃদয়বৃত্তি যেমন প্রবল, তেমনি প্রখর। বাঙালির উদ্ভাবিত দর্শনে তাই বুদ্ধিবৃত্তির পরিচয় পাওয়া যায়। এছাড়াও চিন্তা- যুক্তি-তর্কে, ভাবে-বিশ্বাসে ও বিচার-বিশ্লেষণে প্রবাহমানকার সূত্র ধরে গড়ে উঠেছে এক অনন্য বৈশিষ্ট্য যা বাঙালির দর্শন হিসেবে খ্যাত। "প্রাক-বৈদিক চিন্তাধারা, বেদবিরোধী চিন্তাধারা, ই চিন্তাধারা, দেশজ ও মরমিতত্ত্ব এবং পাশ্চাত্য, ধর্মনিরপেক্ষ বিচারধর্মী চিন্তাধারার সমন্বয়ে, যে ন ভাবধারা গড়ে উঠেছে তাই বাঙালির দর্শন।

অনেকেই নৈরাশ্যজনক কথা বলে থাকেন বাঙালির দর্শন সম্পর্কে। ধর্মকর্মে ঐতিহ্য আছে, কাব্য সাহিত্য ও শিল্পকথা আছে কিন্তু উল্লিখিত বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত কোন দর্শন নেই। তাছাড়া দর্শন চর্চা যে দৃঢ় মানসিকতা ও যুক্তিনিষ্ঠতা থাকা দরকার বাঙালির তা নেই। দর্শন চিন্তায় বাঙালির ঐতিহ্য বিশেষ পরিপুষ্ট নয়। পারিভাষিক অর্থে যাকে দর্শন বলা চলে সে রকম বিশেষ কোন দর্শন নেই। বাঙালি মাত্রই আবেগপ্রবণ, জীবনবিরাগী, কর্মবিমুখ, খাদ্যরসিক ও পরলোক মুখি। ইং ফরাসি ও জার্মান ভাষায় দর্শনের অস্তিত্ব থাকলেও বাংলা ভাষায় তা নেই। তবে আমরা যদি অনুসন্ধান দেখা যায় বাঙালির স্বভাব ও দার্শনিক ঐতিহ্য সম্পর্কিত এসব ধারণা বহুলাংশে ভ্রান্ত। ঠিক যে দর্শনে অন্ধ ব্যক্তির হস্তী জ্ঞান সদৃশ আংশিক জ্ঞান। কোনও অন্ধ ব্যক্তি হস্তীর পা স্পর্শ করে বলে স্তম্ভবৎ" আবার হস্তীর লাঙ্গুলদেশ স্পর্শ করে বলে 'হস্তী রজ্জুবৎ', কর্ণদেশ স্পর্শ করে বলে 'হস্তী কু এভাবে বিভিন্ন অন্ধ ব্যক্তি হস্তীর নিজ নিজ সিদ্ধান্তকে সামগ্রিক সত্য বলে দাবি করে। যদিও সিদ্ধান্তের কোনটিই সামগ্রিক সত্য নয় আংশিক সত্য অর্থাৎ বিশেষ দৃষ্টি কোন থেকে সত্য। এ রকম একটি মারাত্মক ভ্রান্তি।

বাঙালি দর্শন সম্পর্কে যেসব অভিযোগ আছে তা অধিকাংশই ঠিক নয়। প্রাচীনকাল বাঙালি দর্শনের প্রকৃতিদের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার অধিবাসীরা কবে কখন দার্শনিক করেন তার দিন তারিখ নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়। বাঙালি জীবনবাদী বলেই তারা দীর্ঘ প্রত্যাশী। দীর্ঘ জীবন ও অমরত্ব প্রত্যাশা করত যোগ, তান্ত্রিক কায়-সাধনার মাধ্যমে এবং অনুশীলন সাংখ্য যোগ প্রভৃতি নিরীশ্বরবাদী দর্শনের। অনেকে মনে করেন, প্রাচীন বাংলায় লোকায়িতরাই বৈজ্ঞানিক চিন্তার পথিকৃৎ। লোকায়িত মত অনুসারে প্রত্যক্ষই জ্ঞানের একমাত্র উৎস। তাদের

হাতিরিক্ত কোন আত্মার অস্তিত্ব নেই। জগত স্রষ্টা হিসাবে ঈশ্বর অলীক। পুনর্জন্মের ধারনা অবান্তর। চীন বাংলার এই মন বহুদিন প্রচলিত ছিল। দাশগুপ্ত বলেন প্রাচীন বাংলায় লোকায়ত বা চার্বাক দর্শনের ভাব লক্ষ্য করা যায়।

লোকায়ত বলতে বুঝায় সাধারণ লোকের দর্শন, জনসাধারণের দর্শন। 'লোকেসু আয়তো লোকায়ত' থাৎ সাধারণ লোকের মধ্যে পরিব্যাপ্ত বলেই এই দর্শনের ওরকম নাম। লোকায়ত হল ইহলোক সংক্রান্ত ন; যারা পরলোক মানে না, আত্মা মানে না, ধর্ম মানে না, মোক্ষ মানে না, তাদেরই বলে লোকায়তিক। তি-অপ-তেজ-মরুৎ দিয়ে গড়া এই মূর্ত পৃথিবীটাই একমাত্র সত্য, আত্মা বলতে দেহ ছাড়া আর কিছুই যায় না। এই মতানুসারে লোকায়ত হলো দেহাত্মবাদ ও বস্তুবাদ।

আর্যরা ভারতে তথা বাংলায় বৈদিক দর্শন এর প্রবর্তন করেন। তার ফলে বাঙালি চিন্তা-চেতনায় বাদের পরিবর্তে আধ্যাত্মবাদের বিস্তার ঘটে। কালক্রমে বাঙালি হয়ে ওঠেন আধ্যাত্মবাদী পরলোকমুখী জীবনবিমুখ। পরম পুরুষার্থ মোক্ষলাভ হয়ে ওঠে দর্শন চর্চার লক্ষ্য।

বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে সংস্কৃত ভাষায় সাহিত্য ও বিজ্ঞান চর্চার পাশাপাশি যুক্তিবাদী ন চর্চা হতো। শ্রীধর ভট্ট এ ধরনের দর্শন চর্চা করে সর্বভারতীয় খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর ন্যায় দলী, অদয়সিদ্ধি, তত্ত্ববোধ ও তত্ত্ব সংবাদিনি প্রভৃতি দার্শনিক গ্রন্থ বাঙালির তীক্ষ্ণ দার্শনিক চিন্তার র্শন। সেসময় বাংলায় ষড়দর্শন (ন্যায়, বৈশেষিক, সাংখ্য, যোগ, মীমাংসা ও বেদান্ত) চর্চা হতো। দ্ধ শ্রমনরা ধর্মের সঙ্গে দর্শন চর্চায় নিয়োজিত ছিল। শান্ত রক্ষিত, আচার্য শান্তিদেব, শীলভদ্র, তীশ দীপঙ্কর বিখ্যাত বাঙালি বৌদ্ধ দার্শনিক।

শ্রীচৈতন্য দেব হলেন গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্ম ও দর্শনের প্রতিষ্ঠাতা। এই মতবাদের মূল কথা হলো ম-ঈশ্বর প্রেম। বৈষ্ণব মতে মানবসত্তা তিনটি বৃত্তি নিয়ে গঠিত জ্ঞান, কর্ম ও প্রেম। এই তিনটি বৃত্তির ধ্য বৈষ্ণবরা প্রেমের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। এই মনে জ্ঞানে নয়, কর্মে নয়, প্রেম ক্তির মাধ্যমেই কেবল সসীম মানুষের পক্ষে পরম ঐশীপ্রেম অর্জন ও উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রেমের মহান দর্শ চৈতন্যের পূর্বে সাত্ত্বিক ভাব শূন্য হয়ে পড়েছিল। চৈতন্য পরবর্তী কালে প্রেম ধর্ম বা প্রেমাত্মক দর্শন ন্দ্র করে যে তত্ত্ব সাহিত্য রচিত হয় তা বাঙালি চিন্তা ভাবনা তথা সমগ্র উপমহাদেশীয় জীবনে বয়ে আনে ক বৈপ্লবিক পরিবর্তন। এই দর্শনের মূল কথা জাতি নয়, শ্রেণি নয়, কুল নয়, ভক্তি ও প্রেমই মানুষের ষ্ঠ পরিচয়, প্রেমই মানুষের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্পদ।

অদ্বৈতবাদী শংকরাচার্য এর বিখ্যাত উক্তি হল-

ব্রহ্ম সত্যং জগন্মিথ্যা জীবঃ ব্রহ্মৈব না পরঃ অর্থাৎ ব্রহ্মই একমাত্র সত্য, জগৎ মিথ্যা এবং জীব ও ব্রহ্ম অভিন্ন। শ্রীচৈতন্যদেব মনে করতেন শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের যাথার্থ ব্যাখা করেন নাই। বৈষ্ণব মতে যেমন ব্রহ্ম সত্য, জগৎ এবং জীবও সত্য। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মসূত্রের যথার্থ ব্যাখা করেন নাই। বৈষ্ণব মতে যেমন ব্রহ্ম

সত্তা, জগৎ এবং জীবও সত্য। শঙ্করাচার্য ব্রহ্মকে নির্গুণ বলে অভিহিত করেছেন। কিন্তু বৈষ্ণব দার্শ মতে পরমতত্ত্ব কৃষ্ণ নির্গুণ ব্রহ্ম নয়, তিনি হলেন ভক্তের ভগবান। ভগবান জ্ঞানের বিষয় নয়, তিনি বিষয়।

বাংলার এক শ্রেণীর অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, একতারা -আশ্রয়ী, ভাববিদ্রোহী গায়ক, সমন্বয়মূলক মরমী সাধকের নাম বাউল। বাউল হল বাংলার ধর্ম, একান্তভাবে বাঙালির মানস বাউল সাধনা প্রধানত দেহকেন্দ্রিক। তাদের কাছে মানবজীবন ও মানবদেহ পরম সম্পদ। এই মধ্যেই 'আত্মা', 'মনের মানুষ' 'অলেখ সাঁই' বাস করেন। মানবদেহকে আশ্রয় করেই মানুষের সাধন ভজন। সেই সম্পর্কে বাউলদের মূল বক্তব্য হলো-"যাহা নাই ভাণ্ডে, তাহা নাই ব্রহ্মাণ্ডে" মানব দেহের বাইরে বা অন্তরে আর কিছু নেই। চার্বাকদের মত বাউলরারও অনুমান কে অস্বীকার তাই দেহের বাইরে বা অন্তরে আর কিছু নেই। চার্বাকদের মত বাউলরাও অনুমান কে অস্বীকার তাই দেহের বাইরে স্বর্গ কেও অস্বীকার করেন। মানুষের দেহ ও মনের মধ্যে ঈশ্বর বাস করেন। এ বলা হয়-

উপাসনা নাই গো তার
দেহের সাধন সর্ব-সার
তীর্থ-ব্রত যার জন্য

বাউল দর্শনের দেহস্থিত আত্মাকে 'মনের মানুষ' বলে অভিহিত করা হয়। তারা বিশ দেহের সাধন হলেই মনের মানুষকে পাওয়া যায়।

এ সম্পর্কে লালন ফকির বলেন -

... মনের দিশা হলে মিলবে তারই ঠিকানা।
বেদ-বেদান্ত পড়বে যত বাড়বে তত লাঞ্ছনা।

এখানে বলা হয়েছে, নিজে চিনলেই মনের মানুষকে চেনা যায়। নিজের মধ্যেই মনের অন্বেষণ করে দেহের বাইরে পরমাত্মা নয়।

পরিশেষে বলা হয়, বাংলায় যে দর্শনের উদ্ভব ও অনুশীলন হয়েছে তারা সবই যথার্থ একথা ঠিক। তবে লোকায়ত দর্শন, দেহাত্মবাদ, বাউল দর্শন, বৈষ্ণব দর্শন ও ভক্তিবাদ ইত্যাদি নিজস্ব দর্শন। এসব দর্শন জগত ও জীবন বিষয়ক প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেছে। দর্শন চর্চায় ধর্ম বিশেষ প্রাধান্য পেয়েছে। আর এদিক থেকে ঐসব তত্ত্ব আলোচনাকে বিচার, বলে ধর্ম প্রভাবিত দর্শন বলাই শ্রেয়। পাশ্চাত্য দর্শনের প্রভাবে বাঙালির দর্শন চিন্তার পরি ফলে দেশীয় চিন্তার সাথে পাশ্চাত্য চিন্তার সংমিশ্রণ ঘটে। কিন্তু তা সত্ত্বেও এ কথা বলা ঠিক বাঙালির ধর্মপ্রভাবিত দর্শন বা পরলোকমুখী দর্শনের প্রভাব আজ আদৌ নেই।

আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি

ড. নুরুল ইসলাম
অধ্যক্ষ, হীরালাল ভকত কলেজ

জীবনের প্রতিটি বিষয়ে মানুষের নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি আছে। নিজস্ব বিচার বুদ্ধি আছে। মানুষ নিজস্ব কোণ থেকে দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রকে বিশ্লেষণ করে। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলে। তবে ধিকাংশ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচারবুদ্ধি আচ্ছন্ন থাকে পূর্ব ধারণা ও কুসংস্কার দিয়ে। যেমন রঙিন চশমা র থাকলে সব কিছু নির্দিষ্ট একটি রঙে রঙিন মনে হয়। বস্তুত এই আচ্ছন্ন ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি ও বিচার বুদ্ধি সমাজ ও মানব সভ্যতার জন্য ধ্বংসাত্মক। পৃথিবীর যত অশান্তি ও রক্তপাতের উৎস এই আচ্ছন্ন, সাম্যহীন ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি।

মানুষ সহজাতভাবে অদূরদর্শী। আত্মকেন্দ্রিক। স্বার্থপর। তার নিজের সম্পর্কে লার্জার দ্যান ইফ কল্পনা করে। আর অপরের সম্পর্কে বিকৃত ও সংকীর্ণ ধারণা পোষণ করে থাকে। তাকে সর্বক্ষণ ছন্ন করে রাখে এক ধরনের কৃত্রিম ও ভ্রান্ত বিচারবোধ। অপরের সম্পর্কে তার অমূলক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি র চলেছে ঘৃণা ও বিদ্বেষ। অসহিষ্ণুতা ও সহিংসতা। বস্তুত যথার্থ ও ভারসাম্যপূর্ণ কল্পনা ও ধারণা ছাড়া স্পরিক সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি, শান্তি ও সহিষ্ণুতার পরিমণ্ডল সুদৃঢ় করা সম্ভব নয়।

বস্তুত আমাদের দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি হয় দীর্ঘ লালিত ধারণা থেকে। এই ধারণা ও কল্পনার জগৎ সৃষ্টি হয় মাদের শৈশবে। এ ক্ষেত্রে আমাদের পরিবার ও প্রতিবেশীদের ভূমিকা অসামান্য। পরবর্তী কালে মাদের গুরুজন, আমাদের পাঠ্য পুস্তক, আমাদের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এবং আমাদের শিল্প ও সাহিত্য মাদের নিজস্ব একটি বৃত্ত তৈরি করে। এই কল্পিত প্রিজম দিয়ে আমরা আমাদের চারপাশের সকল হুতেই প্রত্যক্ষ করি। আর এরই ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এভাবে আমাদের মাইন্ডসেট তৈরি হয়। নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে ওঠে। ভাবনার অভিমুখ নির্ণিত হয়।

এ প্রসঙ্গে বলা যায়, এ ধরণের বিকৃত ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এদেশের হিন্দু ও মুসলিম সম্প্রদায়ের পারস্পরিক সম্পর্ক নির্মাণ করেছে। এক ধরণের কল্পনা ও ধারণার ভিত্তিতে গড়ে উঠেছে এই ভঙ্গি। বস্তুত এক অদৃশ্য ও অলঙ্ঘনীয় প্রাচীর উভয় সম্প্রদায়ের মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। এই ভঙ্গি প্রায় হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও তাদের পৃথক করে রেখেছে। উভয় সম্প্রদায়ের ষ একটি কল্পিত বৃত্তের বাইরে আসতে চায় না। এই দৃষ্টিভঙ্গির উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে উভয় প্রদায়ের স্বতন্ত্র ডায়লেক্ট, ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি। ভিন্ন জীবন ধারা। সৃষ্টি হয়েছে পারস্পরিক ঘৃণা বিদ্বেষ। অপরকে জানতে না চাওয়ার উন্নাসিকতা। এই সাংস্কৃতিক বৈপরিত্য ও বৈরিতা মিশ্র জাতীয়তাবাদী

বিচারধারাকে কুরে কুরে খাচ্ছে। অসহিষ্ণুতার পরিমন্ডল সৃষ্টি করে চলেছে। ফলে, বিচ্ছিন্নতাবাদী আে প্রোৎসাহিত হচ্ছে। যা ভারতের বহুত্ববাদী সমাজ ব্যবস্থাকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে দিয়েছে। জনগোষ্ঠী যখন একই জাতীয়তাবাদী বিচারধারা একটি অংশের মানুষের জাতীয়তাকে অগ্রাহ্য ক অস্বীকার করে এবং অবাঞ্ছিত প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হয় তখন প্রভাবিত জনগোষ্ঠী বিচ্ছিন্নতাবাদী আন্দো মাধ্যমে নিজ অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চায়। যা বহুত্ববাদী সমাজ ও ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দর্শনের জন্য অি চ্যালেঞ্জ। কোনো জনগোষ্ঠী যখন নিজেদেরকে দেশের যথার্থ উত্তরাধিকারী ও অপরকে অবাঞ্ছিত মনে তখন সংঘাত ও সংঘর্ষের বাতাবরণ তৈরি হয়। আজ সমগ্র দেশব্যাপী যে অসহিষ্ণুতার পরিমন্ডল হয়েছে তা এই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি। এই সমস্যা আঞ্চলিক বা ভারত উপমহাদেশে সীমাবদ্ধ এই সাংঘর্ষিক আন্তর্জাতিক। ইহুদি ও খ্রিস্টান সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে প্রক্রিয়ায়। দু হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও ইহুদি-খ্রিষ্টান সম্পর্ক শুধরানো সম্ভব খ্রিষ্টান সাম্রাজ্যবাদী একটি গোষ্ঠী এই মুহূর্তে ইহুদি সম্প্রদায়ের পৃষ্ঠপোষক। তারা ফিলিস্তিনের মূলনিবা উৎখাত করে ইহুদি পুনর্বাসন করে তাদের ঐতিহাসিক অপরাধ শুধরানোর চেষ্টা করে চলেছে। যদি দৃষ্টিভঙ্গি আধিপত্যবাদী খ্রিষ্টানদের মুসলিম বিদ্বেষের বহিঃপ্রকাশ। তাদের ইহুদি তোষণ ফিলি মূলনিবাসীদের স্বার্থের বিনিময়ে একটি ভয়ানক অন্যায়। কিন্তু তারা এই অন্যায়কে ধারাবাহি জাস্টিফাই করে চলেছে। যথার্থ প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করে চলেছে।

ভারত উপমহাদেশে তিন হাজার বছর পাশাপাশি বসবাস করা সত্ত্বেও, আর্য এবং অনার্য সম্প্র মধ্যে পারস্পরিক অবজ্ঞা ও ঘৃণার সম্পর্কে তেমন পরিবর্তন আসেনি। এক ধরণের বিকৃত দৃষ্টি বিচার বুদ্ধি এই পরিস্থিতির জন্য দায়ী। তিন হাজার বছর। এত দীর্ঘ সময় ধরে বিজয়ী ও বিজিত সম্ বৃত্ত থেকে আর্যরা বেরিয়ে আসতে পারেনি। অনার্যরা পরিবর্তিত পরিস্থিতির সঙ্গে নিজেদের গড়ে পারেনি। ফলে, সার্বিক অ্যাসিমিলেশন সম্ভব হয়নি। স্বতন্ত্র দৃষ্টিভঙ্গি যুগ যুগ ধরে জিইয়ে রেখেছে তথা আর্য-অনার্য সংঘাত। তাই আজও টিকে আছে স্বতন্ত্র বৃত্ত।

একই বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি মানুষের পেশার ভিত্তিতে স্বতন্ত্র পরিচিতি সৃষ্টি করে। চাষী, ব চাকরিজীবিদের মধ্যে স্বতন্ত্র বিচারধারা সৃষ্টি করে। বিভিন্ন পেশার মানুষ পরস্পরকে সমকক্ষ মনে পারে না। তাই বণিকরা কৃষিজীবীদের চাষা বলে অবজ্ঞা করে। এমনকি চাষা বলে গালি দেয়। চাকরিজীবীরা ঘৃণা করে বণিক ও চাষীদের। এভাবে কত সমীকরণ সৃষ্টি হয়েছে। এই ভ্রান্ত ও ধারণা তথা দৃষ্টিভঙ্গি সমাজে সমস্যা সৃষ্টি করে চলেছে। আমাদের সমাজ ব্যবস্থাকে খান খান চুরমা চলেছে এক শ্রেণির মানুষের বিকৃত দৃষ্টিভঙ্গি।

এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বর্ণের ভিত্তিতে মানুষের আলাদা পরিচিতি সৃষ্টি করেছে। শ্বেতাঙ্গরা কৃষ্

মকক্ষ মনে করতে পারে না। মনে করা হয়, কৃষ্ণাঙ্গরা জন্মগতভাবে নিকৃষ্ট। কারণ তারা দেখতে ৎসিত। এই ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন বিশ্বের কোটি কোটি অকৃষ্ণাঙ্গ মানুষ। স্মরণাতীত কাল থেকে শ্বেতাঙ্গ কৃষ্ণাঙ্গ পারস্পরিক ঘৃণা ও অসহিষ্ণুতার ভিত্তি এই ভ্রান্ত ধারণা। এক দেশের লোক অন্য দেশের ানুষের সমকক্ষ মানতে নারাজ। পাশ্চাত্যের মানুষ নিজেদের উৎকৃষ্ট মনে করে। এমনকি শহরের মানুষ ামের মানুষকে সমকক্ষ মনে করে না। কৃত্রিম অস্মিতা আচ্ছন্ন করে রেখেছে কোটি কোটি মানুষকে।

এমনকি মানব সভ্যতার বিবর্তনের ইতিহাস নারী ও পুরুষের সম অংশীদারির ভিত্তিতে গড়ে ওঠা ত্ত্বেও নারীদের সম্পর্কে পুরুষদের ও পুরুষদের সম্পর্কে নারীদের দৃষ্টিভঙ্গি ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি দ্বারা আচ্ছন্ন। াজও জীবনের কোনো ক্ষেত্রে পুরুষরা নারীদের সমকক্ষ মনে করতে পারে না। নারীরা যুগ যুগ ধরে বষম্যের শিকার। পরিবার শাসন থেকে রাষ্ট্র শাসন নারী কোথাও তার যথাযোগ্য মর্যাদা পায় না। এসব কছু ভারসাম্যহীন ও ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির ফলশ্রুতি।

সত্য বলতে কি, ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি বহু ধ্বংসাত্মক সংঘাত ও যুদ্ধের জননী। আমাদের দেশে পাকিস্তান বষয়ে এবং পাকিস্তানের মানুষের ভারতের বিষয়ে ভ্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি উপমহাদেশে চিরন্তন যুদ্ধ পরিস্থিতি সৃষ্টি রে চলেছে। পশ্চিম এশিয়ায় ইসরাইল ও আরবদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘাতের জন্ম দিয়েছে। এই ারসাম্যহীন দৃষ্টিভঙ্গি কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্টি। যুযুধান পক্ষের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন না হওয়া পর্যন্ত পরিস্থিতির রির্বতনের কোনো সম্ভাবনা নেই।

এই বিকৃত ধারণা ও কল্পনা নির্দিষ্ট ভূখন্ডের ও এলাকার মানুষ সম্পর্কে অযৌক্তিক ও অবাস্তব ারণা পোষণ করতে সাহায্য করে থাকে। দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষ মুর্শিদাবাদের মানুষ সম্পর্কে মনকি উত্তরবঙ্গের মানুষ সম্পর্কে কত অযৌক্তিক ও অবাস্তব মন্তব্য করতে শুনেছি। এখনো তথাকথিত অভিজাত শ্রেণির মানুষ উত্তরবঙ্গের মানুষদের তাদের সমকক্ষ মনে করে না। দক্ষিণবঙ্গের অধিকাংশ মানুষ ন্মগত এক ধরনের আত্মশ্লাঘা ও অস্মিতা আচ্ছন্ন। তারা মহানগরী কোলকাতার পরিবেশ বড়ো হয়েছেন। এই পরিচিত তাদের আভিজাত্যের বড়ো প্রমাণ। অথচ এগুলো সব তুচ্ছ বিষয়। মানুষ কোন পরিবারে ও কাথায় জন্মগ্রহণ করবে, তা নির্ণয় করার কোনো এক্তিয়ার নেই মানুষের।

বস্তুত সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি তিল তিল করে গড়ে তুলতে হয়। সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্জন করতে হয়। মেধা ও পরিশ্রম কোনো ব্যক্তির সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করতে অসামান্য অবদান রাখে। যদিও মানুষের পরিবার ও পরিবেশ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি গড়ে তুলতে সাহায্য করে থাকে। মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিভূমি তার পরিবার ও পরিবেশ। পরিবারের ঐতিহ্য ও সৃজনশীল পরিবেশ সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে।

বি: দ্রঃ মতামত লেখকের একান্ত ব্যক্তিগত, বক্তব্যবিষয়ের দায়ভার সম্পাদকমণ্ডলীর নয়।

ডুয়ার্সের চা সাম্রাজ্যের আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের সমস্যার সাতকাহন

মনোজিৎ দাস
সরকারী অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
হীরালাল ভকত কলেজ, নলহাটী, বীরভূম

খ্রীষ্ট জন্মের বহুপূর্বে থেকে যা ছিল সীমান্ত চীনের আদিবাসীদের পানীয়, ব্রিটিশ শাসনের ছিল সীমান্ত অসমের সিংফো উপজাতিদের প্রিয় পানীয় 'পাইন-আপ' তাই আজ আমাদের প্রত উষ্ণ আমেজমাখা 'চা' গত দেড় শতকের বাণিজ্য ছোঁইয়ায় চা এক বিরাট পরিবর্তন আনে উ ভারতসহ দেশের বেশ কিছু অংশে। বিশেষ করে আমাদের জলপাইগুড়ি ও সংলগ্ন দার্জিলিং একশো পঁচিশ বছর হল জলপাইগুড়ি জেলার সঙ্গে চায়ের সংযোগ। এই সময়কালে গোটা অর্থ সমাজ, জীবন, জনগোষ্ঠীর সামগ্রিক বিবর্তনে প্রবলভাবে উপস্থিত এই উষ্ণ পানীয়টি। চায়ের প এসেছে চা- শিল্প, চা শ্রমিক। বিস্তীর্ণ চা-গালিচার সবুজ নান্দনিক রূপ বা সকালের চায়ের কাপের পেছনে যে দীর্ঘ ইতিহাস, হাজার হাজার শ্রমিকের অশ্রুগাথা রয়েছে তার অনুরণন মাচিতে কান আজও শোনা যাবে। মাচিতে কান পেতে এই ইতিহাসকে জানার জন্য। আমাদের ফিরতে হ শতকের মধ্য ভাগে, যখন চীনের একচেটিয়া চা-বাজারে ভাগ বসাতে ব্রিটিশরা চেষ্টা করছে অন্যান্য উপনিবেশে চা-চাষের।

ভারতে চায়ের শুরু অসমে, তবে ব্রিটিশরা একে তাদের আবিস্কার বললেও চা-পানকরা সিংফো, খামতিদের পুরনো অভ্যাস। চা তাদের কাছে ছিল 'পাইন-আপ' মহাচীনের আফিম যুদ্ধের পর চা-বাণিজ্য বিষয়ে চীনের উপর নির্ভরশীল থাকা সম্ভব হচ্ছিল না ব্রিটিশ বেনিয়াদের।

ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের সুবিধার জন্য ভারতে তৈরী হয় চা শিল্প। চিনের একচে বাজারে ভাগ বসাতে ব্রিটিশরা অন্যান্য উপনিবেশে চা চাষের চেষ্টা চালায়। ভারতবর্ষে চা চাষের সূ অসমে। চা উৎপাদনের শুরু ১৮৫৩ সাল থেকে। জলপাইগুড়িতে প্রথম চা বাগান প্রতিষ্ঠিত হয় সালে গাজলডোবায়। কালক্রমে ইংরেজদের সঙ্গে ভারতীয়রাও চা ব্যবসায় উৎসাহী হয়। ১৮৫ জলপাইগুড়ি জেলার প্রথম ভারতীয় একটি জমির গ্রান্ট পান। ভারতীয়র নাম রহিম বক্স। পরের বর্ষ একজন ভারতীয় যুক্ত হন - নাম বাবু বিহারীলাল গঙ্গোপাধ্যায়, ইনি ছিলেন কাঠ ব্যবসায়ী।

যাই হোক চা শ্রমিকদের কথা বলতে গিয়ে চা শিল্পের গোড়াপত্তনের কথা অবতা বাধ্যতামূলক বলেই সমীচীন ছিল। এবার চা শিল্পে শ্রমিক পর্বের আলোচনায় অর্ভিনিবেশ ক যদিও আজকের এই প্রবন্ধের বিষয় ডুয়ার্স মহিলা শ্রমিক সমস্য নিয়ে, তথাপি শ্রমিকদের কথা বি নিয়ে মহিলা শ্রমিকপর্বের মূলকথা আলোচনা করব।

চা-শিল্পে শ্রমিকের ভূমিক অনেকাংশেই কৃষকের ভূমিকার মত। চা-চারা তৈরী, গাছ লাগান, রিচর্যা, পাতি তোলার মত বিষয়গুলো অনেকটাই কৃষি সম্পর্কিত। আর কলঘরে কাজ, বয়লারের কাজ, দাম ঘরের কাজ অনেকাংশে শিল্প শ্রমিকের ধারা বহন করে। সুদূর ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে নিয়ে আসা হয়েছিল ওঁরাও, মুন্ডা, সাঁওতাল আদিবাসীদের এবং দার্জিলিং এলাকার, নেপাল থেকে শিকিছু নেপালি শ্রমিকদের।৬ এভাবে জনশূন্য পর্বত, তরাই, ডুয়ার্স জনসমুদ্রে পরিনত হতে লাগলো। ইলের পর মাইল চা বাগান তৈরী হল।

সুবিস্তৃত এই চা-সাম্রাজ্যের রক্ষণাবেক্ষণ ও পরিচর্যার কাজে তাই পুরুষের পাশাপাশি মহিলাদের গানের কাজে নিযুক্ত করা হয়। এর ফলে ছোটনাগপুর, সাঁওতাল পরগণা থেকে সপরিবারের মানুষ আছে বাগানগুলিতে। বাগান মালিকদের পক্ষে এই ব্যবস্থা লাভজনত ছিল, কারণ মহিলা ও শিশু শ্রমিকদের জে নিযুক্ত করলে পুরুষদের সমপরিমান বেতন দিতে হত না। এছাড়াও সপরিবারে থাকলে পরবর্তী জন্মের শ্রমিক উৎপাদন করা কঠিন হবে না। ১৯২০-১৯৩০ এর দশকে তখন অন্যান্য শিল্পে (যেমন- ট) ও খনিতে মহিলা শ্রমিকেদের সংখ্যা কমে গেছে। বাগিচা শিল্পে তাদের সংখ্যা অপরিবর্তিত থেকেছে। পাতা তোলার ক্ষেত্রে, সার প্রয়োগের ক্ষেত্রে, হালকা চা গাছ ছাঁটাই -এর নারী শ্রমিকদের দক্ষতা গানো অংশে কম তো নয়ই উল্টো। সুচারুভাবে কাজ তুলে দেবার দক্ষতা মহিলাদের মধ্যেই বেশি। জের প্রতি আগ্রহ, দায়িত্বজ্ঞান ও ওপরওয়ালার নির্দেশ মাফিক গুছিয়ে কাজ করার ক্ষেত্রে মহিলাদের গ্যতা নিঃসন্দেহে পুরুষদের তুলনায় বেশি। Sampled Gardens এ show cause বা harge sheet পাবার ক্ষেত্রে নারী শ্রমিকদের সংখ্যা অবিশ্বাস্য রকম কম। মাত্র ২.৫ শতাংশ মহিলা মকের বিরুদ্ধে কর্তৃপক্ষ অভিযোগ এনেছেন। অন্যদিকে অনুপস্থিত ব্যাপারে মহিলাদের চাইতে পুরুষদের খ্যাই বেশি লক্ষ্য করা গেছে।

ব্রিটিশ চা-কররা মনে করত, মহিলারা পুরুষের তুলনায় কাজে বেশি আন্তরিক ও কথা শুনে কমনে কাজ করতে পারে। ব্রিটিশ চা কররা এভাবে মহিলাদের কাছ থেকে বেশি কাজ আদায় করে লেও, মজুরি কিন্তু তাদের পুরুষদের তুলনায় কম দেওয়া হত। এরকম মজুরি বা পুরুষ মহিলার মজুরির ন্নতা দীর্ঘ একশ ভছরের অধিককাল ছিল। অবশেষে ১৯৭৬ সালে তারেদ মজুরি সমান করে দেওয়া । তবে সব বাগানে ঐ বছর থেকেই যে সমান মজুরি দেওয়া হয়েছে তা নয়।

চা-পাতা তোলার কাজটা নানান ভাগে নানন গোষ্ঠিতে হয়ে থাকে। এই চা-পাতা তোলা মেয়েদের খাশোনা করার দায়িত্ব দফাদার বা সর্দারের উপর। দফাদার ও সর্দার সবসময় পুরুষ মানুষই হয়। ত্যক গোষ্ঠীতে বা গ্রুপে ৫০ জন বা তার কম বেশী মেয়ে থাকে যারা পাতা তোলো। সাধারণতঃ এই দিবাসী মহিলারা দিনে আট ঘন্ট কাজ করে সপ্তাহে জয় দিন এই পাতা থেকে তোলা কাজ অবশ্যই সাধ্য। সাধারণভাবে 'ঠিকা' (thika) দেওয়া হয় কোন অঞ্চলে কত চা পাতা তোলা হবে। ঠিকা

প্রতিদিন যাযেওয়া হয়েছে তার ছেয়ে এরা বেশী চা পাতা তুলতে পারে যদি ইচ্ছ করে। তবে উচ্চ
প্রথা 'পিস' (Piece) রেটে হয়। অর্থাৎ শ্রমিকরা আট ঘন্টা খেটে তার থেকেও বেশী খাটতে
মাঝে মাঝে সংসারের প্রয়োজনে ও নানান দরকারে খাটতে ও হতে পারে। অর্থাৎ দিনে ১০-১২ ঘ
স্ত্রী শ্রমিকদের করতে হতে পারে। বলা হয় এই স্ত্রী শ্রমিকদের একটা কষ্টকর জীবন -'Harsh
Profile'

চা-শিল্পে যুক্ত মহিলা শ্রমিকদের মজুরী কম দেওয়া হত। এর পেছনে কোনো বৈজ্ঞানি
নেই। তবে শ্রমিক শোষণের মানসিকতা থেকে যে এটি তৈরী তা না বোঝার কারণ নেই। মহিলা
কম মজুরী দেওয়া হত তা জানা যাক। চা কর্তৃপক্ষ মনে করত মহিলাকে মজুরী দেওয়া হ
পরিবারকে সাহায্য করার জন্য। কারণ সে ছাড়াও তার পরিবারে স্বামী, শিশু সবাই মজুরী পা
মহিলার কোন দায় দায়িত্ব নেই। দ্বিতীয়ঃ মহিলা শ্রমিকরা ছিল অশিক্ষিত, শান্ত এবং অসংগ
শরিশ্রম করেও মজুরী বাড়ানোর 'বারগেনিং' ক্ষমতা অর্জন করত না। যেখানে সব শ্রমিককে আ
হত, সেখানে মহিলা শ্রমিকদের কাছে এ আশা করাও যায় না। তৃতীয়ঃ মহিলা শ্রমিক সাধ
নেয়নি। অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে একরকম বাধ্য হয়ে ওরা এ কাজ করত। সুতরাং ওদের সার্বি
এই মজুরীকে মেনে নিতে বাধ্য করে।

রঘুরাজ সিং তাই সঠিকভাবে বলেছেন, "It is customary to male a disti
on the basis of sex in fixing the general minimum time rates of w
wage differentiations betbeen the sexes have been generally acc
upon the assumption, often fales to be sure, that men and not w
have families to support." প্রসঙ্গে এ,সি, পিজনের বক্তব্য "The common i
that women are normally paid less than men because men's w
have in general to support a family, while women's wages have
to support the women themselves." আর এতে অবাক হবার কিছু নেই।
অসংগঠিত ক্ষেত্রে মহিলা শ্রমিকদের আজও কম মজুরী দেওয়া হয়।১৪

ডি.এইচ. ই. সান্ডার্স ১৮৯৫ সনে তাঁর 'Survey and Settlement of the
ern Duars' গ্রন্থে বলেছেন সে সময় ডুয়ার্সে একজন পুরুষ শ্রমিক পেত ৬ টাকা মাসে। মহি
পেত ৪ টাকা ৮ আনা। ডুয়ার্সে বা তরাইতে সমতল হলো গরম ও অস্বাস্থ্যকর পরিবেশে কাজ কর
তরাই, ডুয়ার্সে ম্যালেরিয়া, কালাজ্বর ও ব্ল্যাক ওয়াটার ফিভারের আক্রমন যখন তখন ঘটত।

ডুয়ার্সে 'Plucking Season' বা পাতা তোলার মাস শুরু হত এপ্রিলে এবং
শেষ অবধি তা চলত। এ সময়ে অতিরিক্ত পাতা তোলার জন্য শ্রমিকদের পারিশ্রমিক বেশী দে

ভার্স তাই বলেছেন মহিলারা এ সময়ে ১০ টাকা থেকে ২০ টাকা মাসে আয় করত। মহিলা শ্রমিকদের
য় এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর অবধি পুরুষ শ্রমিকদের চেয়ে বেশী হত।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য ডুয়ার্সে চা বাগানে কর্মরতা নারী শ্রমিকেরা প্রধানত ঝাড়খন্ড রাজ্যের
ধিবাসী (সাঁওতাল, ওঁরাও, মুন্ডা ইত্যাদি) এই জনগোষ্ঠগুলি ভারতীয় সামাজিক কাঠামোতে নানাবিধ
তিবন্ধকতা, বঞ্চনা ও নিপীড়ণের শিকার। স্বভাবতই চা বাগানের এই আদিবাসী নারী শ্রমিকরা বিভিন্ন
রে বঞ্চিত হয়। তার মধ্যে একদিকে যেমন রয়েছে পুঁজি শ্রম সম্পর্ক, রয়েছে পিতৃতান্ত্রিকতা ও লিঙ্গ
পীড়ণের সম্পর্ক। একজন নারী শ্রমিক একদিকে শ্রমিক, একদিকে নারী এবং আর একদিকে ওঁরাও বা
ডা।

ডুয়ার্স চা বাগিচায় কর্মরত আদিবাসী মহিলা শ্রমিকদের অভাব অভিযোগের তালিকা প্রায় সর্বত্র
কই। মথুরা চা বাগান, কাদম্বিনী চা বাগান, হাসিমারা টি এস্টেট এইসব প্রতিষ্ঠিত বাগানগুলিতে সমীক্ষা
রে দেখেছি শ্রমিকদের অভিযোগের তালিকা একই রকম, সেগুলি হল- চিকিৎসা ও চিকিৎসক নিয়ে,
ানেজারিয়াল পদের কর্মকর্তাদের খারাপ ব্যবহার, ঔষধের অভাব, বাসস্থানের প্রয়োজনীয় মেরামতির
ভাব, জ্বালানির অভাব, পানীয় জলের অভাব এবং বৎসর শেষের বোনাস। ডুয়ার্সে চা বাগিচায় মহিলা
মিকদের শিক্ষার সুযোগের অভাবই তাঁদের উন্নতির মূল অন্তরায়। একজন পুরুষ শ্রমিক যেমন বাইরে
য়ে বিশেষ শিক্ষা নিয়ে ফিরে এসে পদোন্নতির সুযোগ করে নিতে পারে নারী শ্রমিকদের সামনে সে
যোগ খুবই কম। সব থেকে বড়ো কথা হল বাগিচার পরিচালকবর্গের ধারণা সুপারভাইজার পদে মহিলা
য়োগে অসুবিধা হচ্ছে "Labour Control" করতে তাঁরা অসমর্থ। কোনো চা বাগিচায় মহিলাকে
ই পদে কাজ করতে দেখা যায়নি। তবে ডুয়ার্সের একটি উচ্চ বিদ্যালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক হিসেবে
র পাঁচেক কাজ করার সময় অফিসিয়াল নানা তথ্য দেখে মনে হয়েছে বাগিচা সংলগ্ন প্রাথমিক, হাইস্কুল,
লেজ, মহাবিদ্যালয়ে ইদানীং পশ্চিমবঙ্গ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক কল্যাণ তহবিল যেমন - সবুজ
থী, কন্যাশ্রী, মিড ডে মিল ইত্যাদি কারণে নারী শ্রমিকদের সন্তানসন্ততিদের উপস্থিতি অনেকটাই
ড়েছে।

চিকিৎসা বিষয়ে ডুয়ার্সে চা বাগিচায় ব্যবস্থা নিতান্তই অপ্রতুল। নারী শ্রমিকদের মূল অভিযোগ
কিৎসক নিয়ে। অধিকাংশ বাগিচাতেই ডাক্তার হচ্ছেন পুরুষ এবং মহিলারা পুরুষ চিকিৎসকের সামনে
emale diseases নিয়ে আলোচনা করতে সঙ্কোচ বা লজ্জা বোধ করেন। ফলে অনেক চা বাগানেই
ক্য করা গেছে মহিলারা চিকিৎসকের পরামর্শ না নিয়ে তুকতাক, জড়ি, বুটি, ঝাঁড়ফুক ইত্যাদির আশ্রয়
চ্ছেন নিরাময়ের জন্য। চা বাগানে মহিলারা শতকরা ৯৫ জনই জানিয়েছেন যে তাঁরা মেয়েলি রোগের
কিৎসার জন্য বাগিচার ডাক্তারের কাছে যান না। একজন অবশ্য বলেছেন তিনি তাঁর স্বামীর মাধ্যমে
ক্তারবাবুর পরামর্শ গ্রহণ করেন।

বলা হয়ে থাকে যে চা বাগিচায় অন্ততঃ এক ধরণের স্বাধীনতা আছে যা অন্য অনেক গ্রামে
যা হচ্ছে নিজের পছন্দ মতো বিয়ে করার স্বাধীনতা। ছেলে-মেয়েরা মেলামেশা করে- নিজেরাই অ
সময়ে তাদের মনোমত এবং পছন্দ মতো দোসর জোগাড় করে। আমরা যদিও সব শ্রমিকদে
'মদেশিয়া'- অর্থ মদ্যদেশ থেকে আগত। তবুও এদের মধ্যেও অসংখ্য ভেদাভেদ। আমরা যাকে C
System বলি সেই ভাবে নেই হয়তো তবুও নানান বাধা-নিষেধ থাকতে পারত। তবে 'স্বা
থাকার জন্য বিয়ের ব্যাপারে পছন্দ-অপছন্দ থাকার জন্য যে সমাজ ব্যবস্থা গড়ে উঠেছে তাকে বলা
- Melting Pot নানান সংমিশ্রণে এক নতুন প্রজন্ম। যদিও Caste Rule না থাকলে মারে
Ethnic Rule বা Tribal Rule অনেক মেয়ের পক্ষে পীড়াদায়ক। তবুও বাগিচায় আ
সভ্যতার নবজন্ম দেখেছি তা অনেকটাই এই 'স্ত্রী স্বাধীনতা' থাকার ফলে।

চা-বাগিচায় ক্ষেত্র সমীক্ষার নির্যাসটুকু নিলে দেখা যাচ্ছে, স্বাধীনতার পর শোষক শ্রেণি,
ভারতীয় বেনিয়ারা; যাদের কেউ কেউ বা বাগিচা কিনছে আবার কিছুদিন পর অন্য মালিককে বিক্রি
দিচ্ছে। ফলে বাগিচা শ্রমিক আইন নিয়ে ভাবছে না প্রায় কেউই। শ্রমিকদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, সা
পরিবেশ নিয়েও কোনো চিন্তাভাবনা নেই ডুয়ার্সের মালিকপক্ষের। নারী শ্রমিকদের যে পরিবেশে
করতে হয় তা উন্নতমানের নয়। নারী শ্রমিকদের তাঁদের শিশুদের বিষয়ে সর্বদাই মানসিক অশা
দুশ্চিন্তা নিয়ে কাজ করতে হয়। নারী শ্রমিকদের কাজের জায়গার বা তার আশেপাশে কোনোও ল্যা
টয়লেটের ব্যবস্থা নেই বলে শতকরা ৯৮ জনই অভিযোগ করেছেন।

ডুয়ার্সের চা বাগিচাগুলিতে শতকরা ৯৫ ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে প্রয়োজনের
CRECHE খুবই কম। শতকরা ৯১ জন Creche দেখাশোনার দায়িত্ব রয়েছেন Untra
মহিলা। বাগিচার কানুন মোতাবেক যেভাবে Creche হওয়া উচিত বা চালানো দরকার তা
জায়গাতেই নেই। এর লোকেশন, গঠন অত্যন্ত নিম্নমানের। মা শ্রমিকদের মধ্যে তাঁদের শিশুদের
সর্বদাই একটা মানসিক অশান্তি বা দুশ্চিন্তা লক্ষ্য করা গেছে।

ভুবনায়নে যুগে সভ্যতা যখন দ্রুত এগিয়ে চলেছে তখন সব রকমের জনজীবনে তার
পড়ছে। ক্রমশঃ উন্নত থেকে উন্নততর হচ্ছে মানবসভ্যতা। সেই নিরীখে চা বাগিচায় আদিবাসী
শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি সেইভাবে ঘটেনি। চা বাগিচায় নারী শ্রমিকদের অবস্থার উন্নতি ঘটাতে স
বিষয়টি আইনগত, প্রশাসনিক ও সামাজিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে। সামাজিক সচেতনত
তোলার কাজ করতে হবে।

অনিবার্য

ড. চৈতন্য বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক বাংলা বিভাগ

"জন্মিলে মরিতে হবে, অমর কে, কোথা, কবে ?" – এই উক্তিটির ভাব সম্প্রসারণ করেছিলাম
লে পড়বার সময়। আর তখন থেকেই ভাবটা মনের মধ্যে নিয়তই আনাগোনা করে। জন্মেছি যখন,
কদিন মরে যাবই। আজ হোক, কাল হোক, অন্য কোনো দিন হোক মরতে আমাকে হবেই। মরতে হবে
বাইকেই। পৃথিবীতে অমর কেউ হয় না; হতে পারে না। তবু নাকি মরার কথা বলতে নেই, মরার কথা
াবতে নেই। কেন নেই?

বিশ্বসংসারে চিরস্থায়ী কিছু নেই। যে জন্মায় সে মরে যার সৃষ্টি হয়, তার ধ্বংস অনিবার্য। তবে
ময়ের ব্যবধান কম বেশি হতেই পারে। টিকে থাকার সময়কালকেই বলি আয়ু। এই আয়ু করো কয়েক
হূর্ত, কারো কয়েক হাজার বছর। তবে আয়ু একদিন শেষ হবেই। অমর বা অমরত্ব কথার কোনও গুরুত্ব
নই সংসারে। অভিধানে 'অমর' শব্দটা আছে; যার অর্থ – যে মরে না। দেবতারা নাকি মরেন না। তাঁদের
ক বায়োওলজিক্যাল জন্ম হয়েছে ? যদি না হয়, তাহলে মরার কথাও আসে না। পুরাণ - মহাকাব্যের গল্প
থায় ফাঁদের জন্ম বৃত্তান্ত আছে, তাঁদের মৃত্যু কথাও আছে। স্বর্গের যে সব দেবতার জন্ম কথা নেই,
াদের মৃত্যু নিয়ে আমাদের ভাবনাও নেই।

এই মর্ত্যভূমি বা পৃথিবীতে যার জন্ম হবে, যার সৃষ্টি হবে, তাকে মৃত্যু বা ধ্বংসের কবলে পড়তেই
বে। সৃষ্টির যেমন প্রয়োজন রয়েছে তেমনি ধ্বংসেরও প্রয়োজন রয়েছে; নইলে যে জগৎ সংসারে ভারসাম্য
জায় থাকে না। এই ভারসাম্য রক্ষার জন্যই পুরানে, ইতিহাস বারবার যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ, মহামারী, মন্বন্তর
ত্যাদির আবির্ভাব হয়েছে। এই সব মহাযুদ্ধ, মহামারী অনিবার্য হয়ে উঠেছে জাগতিক ও প্রাকৃতিক
রসাম্য রক্ষার প্রয়োজনে।

পৃথিবীর প্রাণী সকলের মধ্যে মানুষ অতি সচেতন, বুদ্ধিমান এবং উদ্ভাবনী শক্তি সম্পন্ন। নিজেকে
বং নিজের জাতিকে রক্ষা করতে, আয়ু বৃদ্ধি করতে মানুষ নানাবিধ রক্ষা ব্যবস্থা, চিকিৎসা ব্যবস্থা উদ্ভাবন
রেছে। তাই, যে হারে মানুষের বংশ বৃদ্ধি, সংখ্যাবৃদ্ধি হয়, সেই হারে মৃত্যু বা ধ্বংস হয় না। ফলে এক
ময় লোক সংখ্যা এতটাই বেড়ে ওঠে যে প্রকৃতিমাতার ভারসাম্য নষ্ট হয়। এই ভারসাম্য বজায় রাখতেই
খন লোকক্ষয়কারী যুদ্ধ, মহাযুদ্ধ বা মহামারী অনিবার্য হয়ে ওঠে। আমরা পৌরানিক যুগ থেকে, কাব্য
থায় ইতিহাসে তারই আভাস দেখে আসছি।

পৌরাণিক যুগের দু'জন মানবকে, যাঁদের পৃথিবীতে জন্ম হয়েছিল, সেই রাম এবং কৃষ্ণকে
অবতার অর্থাৎ ঈশ্বর হিসেবেই পুজো করি। সেই রাম এবং কৃষ্ণ ভগবান হলেও তাঁরা দু'জনেই
কর দুটি মহাযুদ্ধর নেতৃত্ব দিয়েছেন – লঙ্কা যুদ্ধ এবং কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ। মানুষের মৃত্যু হবে ভেবে
যুদ্ধ বন্ধ করার কোনও উদ্যোগ করেন নি। বরং লোক সমাজ ও প্রকৃতির ভারসাম্য বজায়
লোকক্ষয় কর যুদ্ধে ব্রতী হয়েছিলেন।

সমাজে ও প্রকৃতিতে যখন মানুষের সংখ্যা অস্বাভাবিক ভাবে বেড়ে যায়, তখন তাদের
ও খাদ্য সংস্থানে সমস্যা দেখা দেয়। মানুষ গায়ের জোরে খাদ্য ও সম্পদ দখলে আগ্রহী হয়। মানবত
আচরণ মানুষের সমাজে দ্রুত বাড়তে থাকে। মানুষ রাক্ষস হয়ে যায়। রামায়ণের যুগে ছোট লঙ্
এইভাবেই রাক্ষসকুলের উদ্ভব ও বিস্তার ঘটে। যারা খাদ্য ও সম্পদ হরণে লঙ্কা ছেড়ে দক্ষিণ
অন্যান্য দেশগুলোতে হামলা করত। তাদের নেতৃত্বে ছিলেন রাবণ। অধিকাংশ রাক্ষসের মানবিক
হারিয়ে গিয়েছিল। তারা ছিল লালসা পরায়ণ, মমতাহীন, ক্ষমতালোভী, অহংকারী ও অমানবিক
ভগবান রামচন্দ্রকেই প্রকৃতি ও মানবজাতির ভারসাম্য বজায় রাখতে সীতা উদ্ধারের ছলে রাক্ষস
ধ্বংস করতে হয়। এই রাম লক্ষণ ভগবানের অংশ হলেও তাঁরা জন্ম গ্রহণ করেছিলেন এই
অযোধ্যার রাজা দশরথের সন্তানরূপে। তাই, রামায়ণের শেষ কান্ডে তাঁদের মৃত্যুবরণের কথাও
করা হয়েছে।

আর এক মহাযুদ্ধ দ্বাপরযুগের মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ কৌরব ও পান্ডবদের নেতৃ
অক্ষৌহিনী সৈন্য এই যুদ্ধে অংশ নেয়। আঠারো দিন পর, যুদ্ধ শেষে পান্ডব পক্ষে জীবিত ছিলেন স
এবং কৌরব পক্ষে তিনজন। তাহলে উভয় পক্ষে মৃত্যু ঘটেছে প্রায় সাড়ে চার লক্ষ যোদ্ধারই শুধু ম
নি, তাদের সদ্য বিধবা পত্নীরাও বৈধব্য যন্ত্রনা সইতে না পেরে অনেকেই আত্মবিসর্জন দিয়েছে। বং
সম্ভাবনাকে স্তব্ধ করে দেওয়া হয়েছে। এই ভয়ংকর যুদ্ধ ভগবান কৃষ্ণের চোখের সামনেই সংঘটিত
বহু বিখ্যাত যোদ্ধার মৃত্যু তিনি প্রত্যক্ষ করেছেন। কাউকে রক্ষা করার জন্য তৎপর হননি। বর
স্বজন হত্যা হবে বলে পান্ডব সেনাপতি অর্জুন যুদ্ধ করতে না চাইলে ভগবান কৃষ্ণই তাঁকে উপদে
স্বরূপ দর্শন করিয়ে, সত্য অবগত করিয়ে যুদ্ধ করতেই উৎসাহ দান করেছেন।

আঠারো দিন একটানা যুদ্ধ সংঘটিত হওয়ার তখনকার ভারতের প্রায় সমস্ত ক্ষত্রিয় সমাজ
বরণ করতে হয়। ভগবান কৃষ্ণ এই মৃত্যু কেন চাইলেন? এর পিছনে একটাই উদ্দেশ্য – ভার
সংখ্যার ভারসাম্য রক্ষা। যারা জন্মেছে, তারা তো মরবেই। সেই মৃত্যুকে ত্বরান্বিত করতেই এ

ন্যালে মরতেই হয়; সেই মরণ যদি যুদ্ধে হয়, তাহলে ভোগান্তি কম, গৌরব বেশি। এ জন্য যুদ্ধে মরার
রণতাও ছল। কৃষ্ণ নিজের যদু বংশকেও ধ্বংস করেছেন কৌশলে যুদ্ধ লাগিয়ে। নিজেও সত্য রক্ষার
গদিদে জরা ব্যাধের শরাঘাতে মৃত্যু বরণ করেছেন।

বহুযুগ আগে থেকেই অন্যান্য পশুর সঙ্গে সংঘাতে মানুষের মৃত্যু হার খুবই কমে গেছে। রোগে
গে মৃত্যুহারও খুব কমে গেছে। বার্ধক্যজনিত মৃত্যুই মানুষের মরার প্রশস্ত পথ। এই বার্ধক্য পর্যন্ত
পেক্ষা করতে হলে ভোগান্তির পেতে হয়। আত্মহত্যা তো কেউ করতে পারে না ! তাই স্বতঃস্ফূর্ত ভাবেই
নুষের সংখ্যা বেড়ে যায়। অন্যান্য জীবের তুলনায় মানুষের সংখ্যা এতটাই বেড়ে যায় যে প্রকৃতির
রসাম্য নষ্ট হয়। এই ভারসাম্য রক্ষা করা প্রকৃতির নিজেরও প্রয়োজন।

ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখলেও আমরা দেখব, বারবার রাজায় রাজায়, জাতিতে জাতিতে
য়ংকর যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে; লক্ষ লক্ষ, কোটি কোটি মানুষ মারা গিয়েছে। কখনো বা মন্বন্তর, মহামারী,
ড়ক, ভয়ংকর কোনও মারণ ব্যাধি এসেছে লোক সংখ্যা কমানোর জন্য। প্রথম এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে লক্ষ
ক্ষ মানুষের মৃত্যু ঘটেছে। এযুগে রাম বা কৃষ্ণের মতো অবতার এসে যুদ্ধ সংঘটিত করতে পারবেন না।
কালের রাজারাও যুদ্ধে মৃত্যুবরণ করতে ভয় পেতেন না। কিন্তু, একালের রাজারা, মন্ত্রীরা, নেতারা
জে মরতে ভয় পান। তাই সেকালের মতো যুদ্ধে এখন উৎসাহ নেই। এখন আছে ষড়যন্ত্রের হত্যা।
তে লোকক্ষয়, তেমন হয় না। মৃত্যু হার বাড়ে না। তাই পৃথিবীর সব দেশেই জন সংখ্যা অস্বাভাবিক
রে বেড়ে চলেছে। ভয়ংকর অবস্থায় পৌঁছে গিয়েছে।

কাজেই, ধরিত্রীর ভারসাম্য ফেরাতে লোকক্ষয় অনিবার্য। মহাযুদ্ধ, বিশ্বযুদ্ধ মহামারী নয়, এখন
রোনার মতো অতিমারী আসবে বারবার। চিকিৎসা বিজ্ঞানের সাহায্যে মানুষ লড়াই করবে; কিন্তু মরবেও।
ন সংখ্যার ভারসাম্য যে রক্ষা করতেই হবে। পৃথিবীতে শুধু মানুষ বাঁচবে, অন্য জীবজন্তু বাঁচবে না,
কবে না, তাতো হতে পারে না। এত মানুষের থাকা-খাওয়ার ব্যবস্থাই বা কী করে হবে ? উৎপাদনটা
বে কোথায় ? সারা পৃথিবীর দেশ গুলোতে যেখানে ২৫০-৩০০ কোটি মানুষ যথেষ্ট, সেখানে এখন প্রায়
৫০০ কোটি লোকের বসবাস। আমাদের ভারতেই ১৩৫ কোটি ছাড়ালো। গত ১০০ বছরে এদেশে
৫০০ কোটি মানুষ বেড়েছে। এই হারে বাড়লে ভারসাম্য থাকা সম্ভব নয়। প্রকৃতি মাক্ষুদ্র-বৃহৎ, তুচ্ছ-
হান- সকল প্রাণীরই মা। তবে মানুষেরই তিনি কল্যান চাইবেন কেন ? মা হিসেবে সকলের কল্যাণ,
কলের অস্তিত্বের সামঞ্জস্যই তিনি চাইবেন।

বর্তমানে আর সকল প্রাণীর সংখ্যা খুবই কমে গেছে বেড়েছে শুধু মানুষের সংখ্যা। মানুষের জন্যই

বিদায় নিতে হয়েছে কত বন্য প্রাণীকে। আগে কয়েক দশক আগেও কত অরণ্য,বন-জঙ্গল ছিল নেই। মাংসাশি, হিংস্র জন্তু-জানোয়ার এখন বনে জঙ্গলে থাকে না, থাকে চিড়িয়াখানায়। তাদের অতি নগন্য। স্বার্থপর মানুষ নিজেদের নিরাপদ করতেও অধিকার ফলাতে সকল প্রাণীকে করে এটা প্রকৃতিবিরুদ্ধ কাজ।

প্রকৃতির ভারসাম্য ফেরাতে প্রকৃতিকেই – ঈশ্বরকেই মানুষ মারার উপায় সন্ধান করতে করোনা ব্যর্থ হল বলতেই হবে। এবার আসবে অন্য কোনো অতিমারী। মানুষ যখন জন্মেছে, তখন মরতে তো হবেই। বৃদ্ধ হয়ে, অনেক বংশধরের কষ্টের জীবন প্রত্যক্ষ করে, রোগ-যন্ত্রনা সহ্য করে তিলে মরার থেকে কি করোনার মতো অতিমারীকে বরণ করে পৃথিবী থেকে বিদায় নেওয়া ভালো আমরা তো এই পৃথিবীতে কেউ অমর হতে আসিনি। তবু চিকিৎসাবিজ্ঞানের সাহায্য নিয়ে যদি টিকে থাকতে চাই, তাহলে মহাভারতের দ্রোণ পুত্র অশ্বত্থামার মতো দশাই তো হবে। পৃথিবীতে অমর হতে চাইলে এমন একটা সময় আসবে যখন অসহনীয় ভোগান্তিই তার প্রাপ্য হবে। প্রাকৃতিক নিয়ম শিরোধার্য করে, সময়কালে পৃথিবী ছেড়ে যাওয়াই মঙ্গল।

মানুষের আর একটা প্রবণতা বংশ বৃদ্ধি করা; যেন নিজের বংশধরে পৃথিবী ভরিয়ে দিতে সেই বংশধরেরা যে খাবে কি, থাকবে কোথায়, কোন পেশা অবলম্বন করবে, সে সব নিয়ে কোনো নেই। যাদের সে ভাবনা আছে, তারা বংশবৃদ্ধিতে অবশ্যই সংযত। একালে বংশরক্ষার দোহাই দিয়ে বৃদ্ধি স্বার্থপরদেরও স্বার্থরক্ষার পরিপন্থী হয়। তাই প্রকৃতির ভারসাম্য রক্ষার কথা মাথায় রেখে মানুষকে আরও সচেতন হতেই হবে। মরার জন্য এবং অযৌক্তিক বংশবৃদ্ধি থেকে বিরত থাকার মানসিক প্রস্তুতি নিতেই হবে। এটাই যে অনিবার্য।

বি:দ্র:- মতামত লেখকের ব্যক্তিগত, বক্তব্যের দায়ভার সম্পাদকমণ্ডলীর নয়।

Proposed model of consortium in the field of higher education in West Bengal

Mr. ParthaChattopadhyay
Librarian, HiralalBhakat College, Nalhati, Birbhum

Abstract: To provide better service to the user community, resource sharing has now become an inevitable process. With the advent of the new Information &Communication Technology and creation of some important electronic databases lead us to think seriously about consortia movement. There are many consortia initiatives in our country which are now very active and effective for resource sharing. Naturally each and every library network and consortium has some specific goals targeting a specific type of user community. Through this paper a new model of consortium movement in the state of West Bengal is depicted highlighting some specific viewpoints which may seem to be relevant with the present pandemic situation due to sudden outbreak of corona virus. This initiative may add fuel to the present teaching- learning process and research among the academic community including teaching staff as well as students also.

Key words: Consortium, CBCS, Digital Divide, ICT

1. Introduction

At present, no library is self- sufficient in terms of finance and collection. The ever growing demand of the user community may lead to the library authorities to form the collaboration among them. Evolutionary Information & Communication Technology has created a new world for library cooperation. Due to recent developments, initiatives are taken at regional, national and international level to bring libraries together in order to share their collections. The National Commission on Libraries and Information Science (NCLIS) in its National Programmer Document (1975) defined a network as "Two or more libraries and/or other organizations engaged in a

common pattern of information exchange through communications for
functional purpose. A network usually consists of a formal arrange
whereby materials, information and services provided by a variety of li
ies and other organizations are available to all potential users. Librarie
be in different jurisdictions but agree to serve one another on the same
as each serves its own constituents. Computer and telecommunication
be among the tools used for facilitating communication among them."
library network helps in cooperation among libraries. These librarie
connected through telecommunication networks to share documents
services, form consortium, subscribe journals and so on. The activitie
consortium are identification of vendors, invitation of proposals, neg
tion, signing of agreement, enabling access, training, payment to ven
monitoring, usage statistics, analysis and reports.

2. Objectives of the study

i. To help the teachers and students of both colleges and universiti
providing more and more e-resources for smooth continuation of teac
learning and quality research.

ii. To minimize the gap of Digital Divide with active participati
both teachers and students as a whole.

iii. To accelerate the use of e- resources which is the demand of the pr
situation and make users accustomed with the new ICT technology an
come tech savvy.

iv. To suggest a new model for consortium in the field of higher ed
tion in the state West Bengal.

3. Methodology

This paper is an outcome of our critical thinking process. From the
experience of various consortia initiatives help us to prepare this paper.
scope and coverage is limited within the jurisdiction of higher educati
West Bengal. This consortium is a homogeneous one. State aided univ
ties under which the govt. aided colleges are affiliated in the state

Bengal are mainly taking into consideration in this paper.

4. Library Consortia in India

Consortium is ubiquitous because of digital form of information published across the world through Internet. It refers to cooperation, coordination and collaboration among the libraries for the purpose of sharing information resources. In India, the real drive for cooperation was seen during 1980s due to the developments in Information and Communication Technology. Some of the academic libraries have formed consortia. A few of the major consortia in India are given below:

INDEST: INDEST stands for Indian National Digital Library in Engineering Sciences and Technology. It is a "consortia based subscription to electronic resources for Technical Education systems in India" set up by the Ministry of Human Resource Development based on the recommendations made by the Expert Group appointed by the Ministry under the chairmanship of Prof. N. Balakrishnan. Its headquarter is located at Indian Institute of Technology, Delhi. The objective of this consortium are to provide a common gateway of journal literature subscribed by seven IITs and the IISc to subscribe, access and manage their journals; provide common access and search interface for the usage benefit of students and researchers in regional engineering colleges and support them in sharing the collection of IITs and IISc.

FORSA: The Forum for Resource sharing in Astronomy/Astrophysics (FORSA) was held on July 29,1981 at Raman Research Institute, Bangalore with an emphasis on obtaining detailed information related to literature in Astronomy and Astrophysics for speedier dissemination of information.

UGC- INFONET: The University Grants Commission initiated a program called the UGC- INFONET e-journal consortium to provide online access to electronic journals and databases in all disciplines to the universities in India. Its objective was to increase accessibility of electronic resources to the universities. It provides access to more than 7500 core and peer-reviewed journals and 10 bibliographic databases from 26 publishers and aggregators

in different disciplines. So far 209 universities including 14 National Schools and Central universities along with private universities wh associate members have been provided differential access to e-journal National Knowledge Resource Centre (NKRC): The Council of Scie and industrial Research (CSIR) e-journals consortium has been renam NKRC which provides access and Technology.to more than 5000 e nals, patents, standards, citations and bibliographic databases. It also vides access to large number of open access resources in Science and nology.

IIM Consortium: The concept of the Indian Institute of Managemen brary consortium was floated a few years back to provide resources CD-ROM/ Digital databases. HELINET (Health Sciences Library an formation Network): The Rajiv Gandhi University of Health Scie launched HELINET, Health Sciences Library and Information Network sortium on the 15th March,2003 with an objective to create networ libraries in the colleges affiliated to the university to promote resource ing, helps to move these libraries gradually to digital main stream.

SPACENET: It is a communication network of Indian Space Researc ganization using Very Small Apeture Terminal (VSAT) network facilit transmitting and sharing of data, information and other resources bet the members.

CeRA: Consortium of e- Resources in Agriculture (CeRA) was form November 2007 at the Indian Agriculture Research Institute (IARI), New Delhi to provide access to information in agriculture particularly resources to researchers, teachers and scientists, students, extension ers, policy planners and administrators in the National Agricultural Sy (NARS).

ICMR e-Consortia: ICMR has two types of consortia, JCC@ ICMR covers all subscribed journals of ICMR and free journals also. The ICMR e-consortia provides full text access to the journals subscribe ICMR.

New Model of Consortium initiative in the state of West Bengal in the field of Higher Education: Earlier a good number of consortia movements were initiated in India targeting different academic objectives. But in the field of higher education in West Bengal there was no such remarkable initiative so far. In the present pandemic situation due to the sudden outbreak of Corona virus the realization of such consortium movement is felt seriously once again for smooth continuation of teaching- learning as well as research in the field of higher education especially for the under graduate and post graduate level of study.

It is well known to that entire Library consortium is such an initiative where each and every participating member can access more e-resources by investing a minimum amount of money. The more number of inclusions may reduce the cost and the more utilization of good quality of academic resources by the authenticated teachers and students of all participating member institutions without any barrier. It is a common platform of co-operation among the participating member institutions. In the state of West Bengal there are a good number of state aided universities under which a chain of govt. aided colleges are also affiliated by the different universities. Among these universities, the University of Calcutta is the oldest one. The other universities are the University of Burdwan, University of Kalyani, Vidyasagar University, University of North Bengal etc. Besides, recently a good number of state aided universities are established to cater higher education in different areas of West Bengal under which a large number of colleges are affiliated. Such universities are the Barasat State University, the GourBanga University, KaziNazrul University, PanchananBarma University etc.

However, it is found that more than 300 colleges are scattered throughout West Bengal to spread the higher education in the Under Graduate level of study in different subjects including Science, Commerce, Social Science and Arts & Humanities etc. in its adjacent areas. Among the colleges most of the colleges are located in the rural areas where college libraries are not self-

sufficient in terms of resources to support actively the present new syll
of CBCS (Choice Based Credit System) under different universities du
lack of sufficient fund. A university library budget is more than that
college to meet the ever growing demand of the academic fraternity. Da
day such gap will increase due to ever growing cost of resources.

Keeping in mind, consortium initiative among the universities an
affiliated colleges may be an ideal solution in this regard. There are pl
of resources available in digital format in the electronic platform. So,
the actual time to utilize the Information & Communication Technol
rapidly to solve the problem of resource utilization both by the teache
well as students of universities and colleges. The SCOPUS and the We
Science are the examples of such electronic databases. These databases
very costly to purchase by the individual colleges. Under this model,
and every college and university can contribute a little amount of mo
and can purchase such costly databases and all the authenticated mem
can use the resources by investing a minimum amount of money by su
collaborative way. Naturally, in the colleges there is a little scope of
research due to various reasons. One of such reasons is the lack of
quality of resources which may be solved by taking such an initiative
college teachers are now engaged to prepare the questions, classes and ev
ation of both internal as well as external assignments. They get a minim
time for their research work those who are doing their Ph D from the di
ent universities apart from their routine work. The Ph. D is a time- bo
process. At present, the pandemic situation makes it so difficult. So, su
consortium movement may be a great help in this regard. The univer
teachers will also be benefitted under this movement. The Shodhganga
tabases of the completed theses by the Indian universities)
Shodhgongotri(databases of the ongoing Ph. D theses by the universitie
India) must be included in the resources of this consortium movement to
momentum in the research activities. As a result, the teachers will de
themselves whole heartedly for good quality teaching to their beloved

pils.

Almost all colleges are the members of the NLIST consortium of the INFLIBNET network. So, we should be careful for inclusion of resources under this consortium. It will be done according to the need of the target user community. Due to present situation for COVID 19, the whole student community including both college and university suffer a lot due lack of the relevant and sufficient resources which will support the present CBCS syllabus of both under graduate and post graduate level of study under different universities of West Bengal. The college and university teachers may create various course materials in digital format in different subjects according to the present CBCS syllabus which will be very helpful particularly for the students of both UG & PG level and it will be uploaded gradually in the proposed Consortium portal for easy access by the students. The Subject Bengali is being taught in almost all the colleges and universities of West Bengal. But there is no course material on Bengali subject so far. It is very unfortunate to say that there is no single e-content available on Bengali language and literature in the portal of e-PG Pathshala also so far. Not only the subject Bengali but other regional languages and literatures are also neglected here. In our proposed model such long pending neglected subjects should be treated carefully for the huge number of students. These will be done by the mutual collaboration among the teachers of colleges and universities with active supervisions of both the librarians of the college and universities to promote quality and value added higher education in West Bengal.

The advantages of such a consortium movement are manifold. To disseminate the resources among the students and teachers each and every college should create Digital Library platform apart from the traditional one which will be helpful for the colleges at the time of NAAC visit. The newly created universities will also be benefitted largely in the same way. We are very lucky that the oldest university in India that is the University of Calcutta is located at Kolkata which is situated in the state West Bengal. By virtue of

such a consortium movement maximum amount of its budget may be sp
for its infrastructural and other development purposes which will be hel
for gaining the international status. During the present COVID 19 pande
situation the remote access facilities may be extended to the authorized
ers also for easy access of the resources.

Role of the Librarians: The Librarians of the colleges and Assistan
brarians of the Universities may act as the coordinators of this propo
new model of the consortium initiative in the state of West Bengal. T
should discuss with their respective authorities and make them aware o
benefits of such movement. They also try to make convince of their res
tive authorities to make it a successful one. They should monitor the w
project unless and until its successful implementation at the ground lev
will be possible by the negotiation among themselves and with the Dep
ment of Higher Education, Govt. of West Bengal. Without the bold sup
of the government no project will be successful one. It is also their res
sibility to make the govt. aware about its various positive sides.Not only
this but the help of the IT specialists regarding this matter and negotia
with the resource suppliers help to implement this project at the gro
level.

Conclusion: Not only the creation but its successful implementation i
main point. Awareness among the college teachers as well as the stud
should be formed by the active support of the respective authority with
proactive assistance of the library staff. In such cases, orientation prog
may be organized time to time to make all concerned aware about its us
get full advantage of it.

Library can take an initiative to make such new consortium initia
into a successful one and prove once again the important role of librari
the field of higher education.

Lockdown in Memes : The Difference Between Humour and Satire

Priyanka Basu, Visiting Faculty
Department of English, Hiralal Bhakat College

The year is 2075.

" Grandma ! Why do you like sitting outside ? "

Me : There was a time when this was illegal.

This may or may not happen in the future. But, it has been never seen in the planet before that three billion people across the world stay indoors during lockdown. Some people sharpen their creativity in this lockdown, while others have fun with jokes , flooding in through memes, cartoons, videos in their mobile phones. These memes are all going around the world in minutes, through social media, particularly through WhatsApp and Facebook. From the ground level to the highest, memes are popular everywhere. An internet meme which dominates our newsfeed more than the actual news itself, was once started off as a simple way to share a joke, has now grown into an internet phenomenon and cultural one too. Aiming to make us laugh, memes have the ability to identify the common feelings, experience or opinion. There are many times when we see funny memes and think 'that is so me 'and then proceed to tag our like-minded friends.

This is clear that memes serve more than just a source of entertainment. They can influence, they can brainwash, they can unite, they can tear apart, they can even propel the unknown subject of a picture into worldwide fame. Today we all know the ' Cha Kaku ' – ' *Amra ki cha khabona? Cha khabona amra ?*' (Will we not have tea?). A meme has the power of changing destiny. Mridul Kanti Deb , the Cha Kaku never thought that he could

become so popular and well known in the lockdown. Netizen's Cha Kak
a daily wage labourer who was filmed having a cup of tea at a roadside
on the day of *janta* curfew. He has become the face of lockdown meme
the city after his muted plea to have tea, spawned thousand of memes
videos on social media. After that incident many people came to help Mr
Deb economically. During this lockdown, people staying at home are
nected digitally through social media. Memetics is a way of looking a
world where we live , we try to analyse these factors of life in various
cumstances.

Memes are mediums that communicate information through humour
satire. The 2016 internet consumption records mention that there
462,124,989 internet users in India , which constitutes 34.8% of the pop
tion of India. The media consumers are not merely the passive recipien
contents but they are active participants as they understand and asses
content. One new medium of participatory communication is 'Internet Me
Richard Dawkins, a pioneer in the field of the study of memetics, introdu
the concept of 'memes' in his book *The Selfish Gene*(1976). The
'meme' comes from the Greek word 'mimeme' which means 'to imi
This concept then become a part of the popular culture. With the emerg
of internet and digital technologies, the term 'Internet Meme' gained p
larity. According to Patrick Davison,'Internet Meme' is " a piece of cu
, typically a joke, which gains influence through online transmission" (Bu
2012) (Dawkins 1989). Internet meme is considered as a medium of pro
tion which can reach wider audience in a short span of time. Along wit
different measures implemented by the countries to flatten the cur
COVID – 19, internet memes also teach the common people about the
cessity of using masks and sanitizers as many memes are there in the int

that show the importance of wearing masks in a playful language.

While hilarious , this comparison highlights the importance of remaining home quarantine during the pandemic situation.

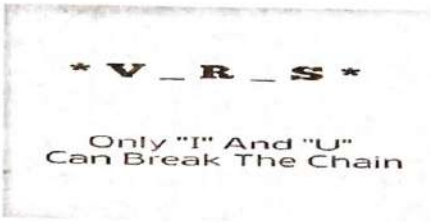

Figure 2 Taken from " Politically Incorrect ", www.twitter.com

'Laughter is the best medicine'- the presence of humour in man's life lightens the burden and inspire hopes within him. Scrolling through a Facebook page provide some relief after a stressful day. Despite the fearful circumstances of present situation, memes can provide anyone with laughter. Besides, giving a smile on face and communicating with others, memes serve another purpose of helping the people to understand a concept, idea or opinion that may not heard about, thought of or considered before. The words

like 'isolation' ,'home quarantine', 'social distancing' have become the d
habits of people nowadays, these concepts can be better understood b
simple internet meme. Many people from the lower stratum of the soc
have an access of internet connection today, for them these memes act a
important medium to understand these concepts in a better manner.

The concept of social distancing becomes clear in these types of me

Figure 3 Taken from www.dezeen.com , originally designed by Slovenian graphic designer Jure Tovrljan

In the choking atmosphere of lockdown, these types of memes go viral wi
seconds. Memes are one of the best way to get a laugh out of the world
also to spark the learning. Some could argue, memes reduce the seriousn
of the disease, but for others laughter is the best medicine to beat the bl
resulting from the coronavirus and lockdown. But the question is, wh
the reason behind the huge popularity of internet memes?

The recent studies show, the average human attention span has rece
dropped from 12 seconds to 8 seconds. People cannot concentrate for a mi
to read articles, watch television or even read newspaper columns. Read
even a paragraph or watching a video requires the devotion of a seemin
large portion of time for the average millennial / Gen Z's, while scroll
through a social media feed might require a maximum of a few seconds
focus per post. Memes satisfy this desire for fast and efficient media ; a f

words scattered around a photo of interest. Memes also have no require-
ments for headphones or a larger screen to view. Psychologically memes are
having an immense influence on the world. That Déjà vu feeling when a
meme is created on something which an individual have seen or read before
or based on the cult s(he) follows, subconsciously involves him/her in the
topic and fulfil his/her need for affiliation in the world, which is becoming
more and more self contained. When an interesting meme goes viral, it greatly
impacts the PR ratings of whosoever the meme is about. There is a great
effect in Google Search results , which may define the approach of the sub-
ject to go about the topic. Memes are great tools for communication and
expression within virtual communities, but memes have the power to affect
human psyche dangerously. Memes are selfish and their main goal through
transmission is to mass produce, mimic accurately and survive longest. This
means that certain internet memes can influence people to define themselves
in terms of the identity of a group , they depersonalize or self stereotype to
fit within certain norms. When a person feels that he/she fails to "fit in" with
a community, or if they recognise that they cannot replicate certain memetic
behaviours like social fluency accurately, they may grow anxiety and pho-
bia of social interactions. Facebook's 'tag a friend 'memes', where several
Rahuls, Abhijits have been tagged on some of the most sexist and racist
memes, where pictures of some Afro-American actresses (black women)
have been tagged. These memes are problematic on so many levels. Firstly,
these memes project those women whose photographs are at the centre of
the memes as undesirable, as 'other'. The whole joke around tagging a Rahul
or Abhijit is the fact that the women in the meme are projected as over-
weight, ugly and dark coloured, hence ' undesirable ' which would be a
matter of shame for any Rahul or Abhijit. The feeling of the 'undesirability'

of the person in the meme rises from the deep rooted classism and caste in the minds of the people , where a dark skinned woman is often look down upon and a fair skinned woman is often held as a benchmark of bea Most of the women in these pictures are fat which brings forth the dis ing idea of body shaming, reinforcing beauty standards set by society media. Since the emergence of the coronavirus, it seems as if COVID-1 the only thing that internet discuss about. From emergency declaration the government to giving a vaccine to the individual, every incident g birth to million new memes. While people should take a number of pre tions against the crisis, much of the apocalypse chatter has been hinged u the different online gossips about the outbreak's spread. In one hand , a constant stream of news coverage has definitely contributed to the panic accompanying glut of memes and viral videos that stems a number of fa narratives and outright conspiracy theories have also become a cause concern. Given the fact, that thousands of times , opportunists tried to ca in on the ' corona virus meme accounts ', there has been an influx of cont spouting incorrect information related to the outbreak's spread and prev tion . In a world where more and more young people turn toward meme major news sources, the dissemination of accurate information in a dig ible, attention-catching way is inherently valuable in and of itself. It sho be noted that internet's corona virus obsession is symptomatic of ano psychological phenomenon related to the way we grapple with lesser kno fears and threats. It is well known in psychology, that the process of talk about traumatic events can help people to relieve their stress. So, ther something good about engaging in viral content related to the COVID- there should also be a level of discretion when choosing to share cert content, especially if it has the potential to influence the health choices

others or increase hostility toward others.

The 'group thinking' effects of memes can lead to various fallacious behaviours. Group thinking or deindividualization can lead to the bandwagon effect, appeals to tradition and authority. The bandwagon effect is the psychological phenomenon where people mimic others regardless of what they think or believe. All beliefs and ideas are overridden by the urge to imitate. Mimicking the majority just because it is popular does not mean that whatever is being mimicked is correct or good, Some celebrities, some political leaders get lots of hate for no traceable reason and this is because large mass of people hate them. Sometimes people even do not know the reason why they hate certain public figures, they do because everyone else does. When this 'hate meme' is spread successfully to many hosts the bandwagon effect becomes very common. This can also be flipped and can become a bandwagon ' love meme '.

Internet meme has the power to assign bias for or against certain things, individuals or communities . In order to prevent the dangerous effect of memes we must recognise the main theme of the meme as well as the consequences it can create and affects the varying parts of our life. Memes are everywhere and they control so much of what we believe. Memes survive by giving everyone a voice. We are all the participants in the meme orchestra, we should build a good knowledge of the music and playing instruments and we must have the prudence to separate the beautiful melodies from the cacophonies of both beautiful and horrible.

The Sound of Rain

Priyanka Basu, Visiting Faculty
Hiralal Bhakat College

The rain has stopped a while ago. The window in Sneha's room crumpled, just as the room. Wafts of the rain-cooled breeze are blowing rustling her uncombed hair, ruffling the pages of the bunch of prescripti which are there on her bedside. Staring out the window, she struggle remember the face of the man who came to see her, perhaps a while long ago. Nowadays she cannot remember time. The wind howls outs She tries hard to recollect the face of the person. His face is absolu different from the nurse, from the doctor, from everybody surrounding h There is something on his face that soothes her eyes. Suddenly Sneha fe a headache, a pain inside her brain and a number of voices urging her to the nurse. The voices rasp and crackle, force her to decapitate the nurs suffocate her, drive the needle into her neck and release air to create embolism. She has no knowledge about what an air embolism is but t voices tell her how to give her one. The monotonous depressing rain creases the dullness of the room. The nurse shows an ID card to Sneha has a photo of a woman with a serious face having olive skin and bla shoulder-length hair. The girl on the card is Sneha, a photo that was click in the studio when she was a student of St. Anthony's College. Once a she feels the voice rasps in her head that instructs her to collect the rainde and gather enough water in the hospital room to drown the nurse. But Sne tries her best to ignore the voice. Suddenly a man appears in the room. T same person whose face soothed Sneha's eyes. Sneha observes that the mas of that man's turns into a frown and the man says, ' I have completed all t

formalities necessary for discharging the patient '.

The famous mental hospital of Kolkata has released Sneha with Amit, her husband. Rain revives memories of loss. Amit and Sneha catches a taxi. Amit, an employee of IT sector lived alone in a small apartment after the doctor recommended him to admit his wife in the mental hospital. Since then social media is the only friend he has. But after one year when he is sitting beside his best friend, his wife, he does not want to lose enjoying a single moment of his life with his wife. To avoid getting lost among the relentless series of beeps from his social media accounts, Amit concentrates on Sneha. He gently holds her hands.

One afternoon, there was this norwester, blackening the sky and sending people looking for cover from the cyclone dust and little icy raindrops. In the midst of this chaos, Sneha came running for shelter in the room of his college. That was the day when Amit first saw her. But that was not love at first sight, he was captivated by her voice that mesmerized him when she was singing at the college fest. Which song was she singing? The song was ' Rimjhim gire sawan ! Sulag sulag jaaye man.' – that song which was relevant for that July of six years ago and also appropriate for this July. Songs are as meaningful as the lighthouse to the wandering ships. Although Sneha hs never shown any kind of abnormal behaviour in her college days. But after her marriage with Amit, she started hearing chaotic voices and commanding type of auditory hallucinations. Doctors analysed these symptoms as the first stage of schizophrenia. From her early childhood she was exposed to aggressive behaviour of her father. Marital problems and domestic violence since marriage led to divorce her parents, when she attained the age of ten. Life could be very unpredictable to the person who loves someone with mental disorder. The taxi runs behind the backs of the houses, crossed a street of blinding windscreens. Amit sees that Sneha is sleeping,

she has a habit of sleeping in the running car like an innocent child who invites Amit to look within her heart , which is like the compass ,the needle spinning until it finds real love , its true north. Amit tries to support his sleeping wife with his shoulder like a pillar. It is a beautiful day and the sky is like a dome of plasma blue. The clouds are looking like the airy anvils drifting under the gleaming disc of sun. The sun pours out its brilliant yellows on the face of Sneha. Amit realizes that there is hope even when your mind tells you that there is not. He needs to stand with his wife. People struggling with mental illness can live a full , happy and productive lives , if they have the right resources. He requests the driver to turn the taxi towards the direction of their college. The wind blows in. The hair rustles. He takes a selfie with his wife and uploads it in social media with the caption #our_way_to_college_recapturing_the_days_of_our_college_life#.

'শিক্ষা ও সমাজ'

জুঁই মুখার্জী

শিক্ষা হল মৃতসঞ্জীবনীর মতো একটি ঔষধ। যে ঔষধ সেবনে মানুষ শিরদাঁড়া সোজা রেখে জীবন যুদ্ধে বেঁচে থাকে। এমনিতে মৃতসঞ্জীবনী খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। কিন্তু শিক্ষা ? এটি সর্বত্র ছড়িয়ে আছে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় যেমন এক একটি শিক্ষালয়, ঠিক তেমনি 'সমাজ' হল সবচেয়ে বড় শিক্ষালয় । এখানে (সমাজ) সমস্ত ধরনের (ভালো মন্দ) শিক্ষা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। এবং শিক্ষার্থীর সংখ্যাও অসীম ও আর শিক্ষক ? শিক্ষকের সংখ্যাও প্রচুর।

একটি শিশুর জন্মের পর তার শিক্ষাগুরু মা তারও পরে বাবা ও তারপর তার পরিবার, ঠিক সঙ্গে সঙ্গে অজান্তে যুক্ত হয় সমাজ। আর বিদ্যালয় ? বিদ্যালয় কাজ করে সমাজের অংশ হিসাবে। তাই মানব জাতির উন্নতি ঘটাতে হলে, প্রথমে প্রয়োজন সমাজের উন্নতি ঘটানো আর সমাজ হলো স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের মতো। এখানে ভালো-মন্দের পার্থক্য করা যায় না।

আমার মনে হয় বর্তমান আর্থ সামাজিক প্রেক্ষাপটে আমরা প্রত্যেকেই খুব বেশি করে শিক্ষা সম্পর্কে কথা বলে থাকি। বিশেষ করে রাষ্ট্র পরিচালকগন আমাদের স্বয়ংক্রিয় শিক্ষালয়কে যথাযথ মান্যতা দেওয়ার জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করে থাকে।

কিন্তু যখন তাঁরা স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রটিকে উন্নত করার পরিবর্তে পরিচালনা করার চেষ্টা করেছে ফল হয় বিপরীত।

তাই শিক্ষা সকলের কাছে পৌঁছে দিতে চাইলে সমাজে সুস্থ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা উচিৎ। সকলকেই যে পুঁথিগত শিক্ষায় শিক্ষিত করতে হবে সেটি ধারনা করা অযৌক্তিক বলে মনে করি। বিদ্যালয় অভিমুখ থেকে সমাজ নয়। সমাজের অভিমুখ থেকে বিদ্যালয়।

সুতরাং সুন্দর সমাজ গঠনের চেষ্টার বীজ প্রত্যেক সেই নাগরিকের বপন করতে পারলে আমরা প্রত্যেক মৃতসঞ্জীবনী পান করতে পারবো। এই সমাজ হয়ে উঠবে অমৃততুল্য।

'চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু...'

ড. শুদ্ধসত্ত্ব ব্যানার্জী

হীরালাল ভকত কলেজ এক আদর্শ শিক্ষাক্ষেত্রের উদাহরণ। ছাত্রছাত্রীদের বৌদ্ধিক বিকাশে
সাথে সাথে তাদের সুস্থ-সবল ভবিষ্যৎ নাগরিকরূপে নির্মাণ করার কারিগর এই কলেজ।

একজন মানুষের পরিপূর্ণ বিকাশ তখনই সম্ভব, যখন তিনি দৈহিকভাবে সম্পূর্ণ সুস্থ হবেন
মানবিক এবং কায়িক উভয়দিকে থেকে সবল হলে তবেই একজন ব্যক্তি সমাজ গড়ায় অগ্রণী নিতে সক্ষ
হন। পড়াশোনার পাশাপাশি খেলাধূলা, শরীরচর্চা এগুলিও যে অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়
নিয়ে তুলনামূলক কম সচেতনতা দেখা যায়। যদিও এই প্রবণতা কমছে। শরীরচর্চা করা আর তাকে
রাখার প্রয়োজনীয়তা বর্তমান সমাজে ক্রমবর্ধমান আর এখানেই হীরালাল ভকত কলেজ ব্যতিক্রমী।

এই কলেজ NCC, NSS এবং Physical Education বিভাগ রয়েছে। বর্তমানে হীরালাল ভ
কলেজ কর্তৃপক্ষের উদ্যোগে একটি মাল্টিজিম তৈরী করা হয়েছে, ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক উন্নতির জন
একটি আদর্শ মাল্টিজিমের প্রয়োজনীয় বেশ কিছু ইন্সট্রুমেন্ট রয়েছে। যেমন- অ্যাব বেঞ্চ, রিস্ট ক
মেশিন, ইনক্লাইন, ডেডলাইন বেন্ট, কোড ব্যাক এক্সটেনশন বেঞ্চ, ক্যাট বেঞ্চ, ট্রেডমিল, ক্রসট্রেন
ডাম্বেল সেট, প্লেট সেট ইত্যাদি। কার্ডিও ও স্ট্রেংথ ট্রেনিং ইত্যাদির সুব্যবস্থা রয়েছে।

সঠিক পদ্ধতি অনুসরণ করে একজন দক্ষ প্রশিক্ষকের তত্ত্বাবধানে শরীরচর্চা করলে যথাযথ
পাওয়া এবং সুস্বাস্থ্যের অধিকারী হওয়া সম্ভব। এই জিমের প্রশিক্ষক শ্রী সুমন জানা মহাশয় অত্যন্ত দক্ষ
এবং নিষ্ঠার সাথে নিজের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রত্যেক শিক্ষার্থীর প্রতি তিনি সমান মনোযোগী। তি
International Gold's Gym advance personal trainer (rank of master) hard worku
spectalist, International Karate 1st dan Balck belt এছাড়াও তিনি Indian dietetic associat
এর সাথে যুক্ত। Helen Keller Blind Organization এর মতো সমাজসেবী সংগঠনের সাথেও
তিনি। দীর্ঘ ৩২ বছরের অভিজ্ঞতা দিয়ে শিক্ষার্থীদের উদ্বুদ্ধ করে চলেছেন। ছাত্রদের পাশাপাশি ছাত্রী
জিমে ভর্তি হচ্ছে এটি আশার কথা। শুধু তাইই নয় অধ্যাপক-অধ্যাপিকরাও জিমে অংশগ্রহণের বি
যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছেন এটিও খুবই আশাজনক।

হীরালাল ভকত কলেজের এই উন্নত চিন্তা ও তাকে বাস্তবায়িত করার জন্য গৃহীত প্রয়াসের প্র
আন্তরিক শুভকামনা রইলো।

ভাষাশহীদদের প্রতি বিনম্র শ্রদ্ধার্ঘ্যঃ উপস্থাপনায় ছাত্রছাত্রীরা।

দিশারীর পথ চলার আর ও একটি বছর।